পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১৫

ফিরে দেখা বিজ্ঞান আন্দোলন
বিজ্ঞান আন্দোলন অথবা কূপমণ্ডুকতার চর্চা
স্মরণের সরণি বেয়ে
মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
স্বপন কুমার দাস
বিনায়ক দত্তরায়
খবরে পরিবেশ বিপন্নতা
পরিবেশ ছড়া
ক্লিওপেট্রার শেষ নিঃশ্বাস

মনীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার (১৯৩৮ — ২০১৫)

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
বর্ষ 37 সংখ্যা 1-4
জানুয়ারী-ডিসেম্বর 2015

প্রযত্নে : রবীন মজুমদার
B/27/1 কালিন্দী হাউসিং এস্টেট
কলকাতা- 700 089

মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা

Vigyan O Vigyankarmi
Reg No. 34929/79

Vol. XXXVII No. 1-4
January 2015 - December 2015

Contact :
Rabin Majumdar
B 27/1 Kalindi Housing Estate
Kolkata-700 089
Website : www.scienceandsocietyinbob.com

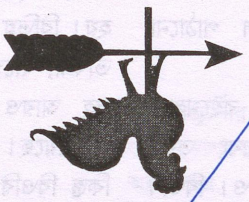

নষ্ট বায়ু ওষ্ঠে প্রাণ

দূষণ প্রতিরোধ করুন

WEST BENGAL

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

(পরিবেশ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

Frontway/PCB/200/2015

ফিরে দেখা

বিজ্ঞান আন্দোলন অথবা কূপমণ্ডুকতার চর্চা

রবীন মজুমদার
(rabin_majumdar@gmail.com)

১. শেষ থেকে শুরু

রাত প্রায় বারোটা, মোবাইলটা বেজে উঠল।

এত রাতে আবার কে ফোন করল। আছে অবশ্য দু-একজন বন্ধু—এরকম রাতেই তাদের ফোনের সময় হয়। কোন অসুখ-বিসুখ বিপদ-আপদের খবর নয় তো! ফোনটা ধরতে গিয়েই নামটা দেখলাম। পুরনো বন্ধু, সহযোগীই তবে অনেকদিনই হল যোগাযোগটা ক্ষীণ। নাম ধরেই বললাম, কি খবর, ভালো আছো-তো সবাই? পাশ কাটিয়ে ওপাশ থেকে শুকনো গলায় এল পাল্টা প্রশ্ন—শুয়ে পড়েননি তো?—না, তার আরও একটু দেরী আছে। এবার গলাটা আরও গম্ভীর-গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে আমাদের আলোচনায় এলেন না!

—ও তুমি সেই গোখেল সেন্টারে হওয়া আলোচনার কথা বলছ, সে তো বেশ কিছুদিন আগেই হয়ে গেছে, আমি তো তার খবরই জানতাম না, পরে শুনলাম; তারপরেও কি আর কিছু হয়েছে?—না, সেটার কথাই বলছি। আপনি আসেন নি অথচ আপনি বলেছেন, আমরা নাকি দিল্লীর প্রভাবশালী এনজিও'র মাধ্যমে আমেরিকার টাকায় প্রচার করছি যে গ্লোবাল ওয়ামিং-এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই! কঠোর এবং কঠিন শোনালো পুরনো বন্ধুর গলা।

—কে বলেছে তোমাকে?

—এটা কিন্তু আপনার কাছ থেকে আশা করিনি।

কয়েকদিন আগে ডিপার্টমেন্টের রি-ইউনিয়নে—এরকম একটা বিষয়ে তর্ক হয়েছিল মনে পড়ল। আমি সেখানে বলেছিলাম বটে যে কিয়োটো চুক্তির পরে আমেরিকা সেটাকে সরকারিভাবে মানতে চাইলোনা, তাতে নাকি তাদের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তাই আমেরিকা বিরুদ্ধ একটা বৈজ্ঞানিক মতও গড়ে তোলায় মদত দিতে সচেষ্ট। অনেক নাম করা বিজ্ঞানী এমনকি নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীও এখন বলছেন-ভূউষ্ণায়ন তত্ত্বটার ভিতটা পোক্ত নয়। অনেক ভুলভাল তথ্যের উপর ভিত্তি করে অনেক তথ্য চেপে গিয়ে এই তত্বটা দাঁড় করানো হয়েছে। বেশ কিছু বিজ্ঞানী-আগে যাঁরা ভূ-উষ্ণায়ন তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন-তারাও পাল্টি খেয়ে (বা ভুল বুঝতে পেরে) অবসরের পর বলছেন ভূ-উষ্ণায়ন একটা ধাপ্পাবাজি। প্রচুর পেপার বের হচ্ছে। মুদ্রিত জার্নালে, তার চেয়েও বেশী, নানা ওয়েবসাইটে, ই-প্রকাশনায়। দেশে দেশে সেমিনার-কনফারেন্সের ধূম লেগেছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করতে, আর সেসবের জন্য নানা সূত্রে টাকাও পাওয়া যাচ্ছে।

বুঝলাম, আমার সেই তার্কিক কথাগুলিই পল্লবিত হয়ে উঠেছে বন্ধুর কানে। সর্তকভাবে বলি—আরে এরকম তর্ক তো আমরা করেই থাকি, তোমাদের অনুষ্ঠানের কথা তো এভাবে আমি বলিনি, কারণ আমি যাই-নি, তাছাড়া 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীতে'ও তো এরকম প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে।

—না, না, ওরকম শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করবেন না। আপনারা আসলে কুয়োর ব্যাং, কোথাও যাবেন না, দেখবেন না, বুঝতে চেষ্টা করবেন না, কিন্তু পিছন থেকে ল্যাং মারবেন, চরিত্রহনন করবেন।...

হিসহিসিয়ে উঠল বন্ধুর গলা। আমি যতবারই কিছু বলতে চাই, আমার কথায় আমল না দিয়ে বন্ধু বলে চলে—গেছেন কখনও দিল্লীর ঐ এন জিও'র অফিসে, গেলে বুঝতে পারতেন বিরোধিতাও কতটা প্রফেশনালি কতটা দক্ষতার সঙ্গে করতে হয়। আপনাদের মত অ্যামেচারিশ ভাবনার দিন আর নেই, সেটা আপনারা বুঝতেও পারেন না। কটা লোক পড়ে আপনাদের পত্রিকা, কটা লোক আসে আপনাদের আলোচনায়?...আমাকে আর 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পাঠাবেন না। টেলিফোনটা হঠাৎই শেষ করে দিল বন্ধুবর।

শুতে যাবার আগে মনটা বিক্ষিপ্ত হলো। দুঃখ পেলাম। আবারও বন্ধু বিগড়োল। মানুষের তৈরী ভূ-উষ্ণায়নে পৃথিবী বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তাকে থামাতে হবে—এই তত্বের বিপরীতে আর একটা তত্ত্ব— মানুষের ক্রিয়াকলাপে কোন বাড়তি ভূ-উষ্ণায়ন ঘটেনি, যা হয় বা হচ্ছে তা প্রাকৃতিক চক্রের মধ্যেই। এরকম দুই মতে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা তর্কে মেতেছে। যেমন তর্ক আছে পরমাণু বিদ্যুৎ নিয়ে বা

জিন-বদলানো খাদ্যশস্য নিয়ে। এমনিতে এগুলো বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তর্ক ঠিকই, কিন্তু গোল বাধে যখন একটাকে ভিত্তি করে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড শুরু হয়, —'উন্নয়নের' স্বার্থে, 'মানুষের জীবনকে বদলে দেবার' লক্ষ্যে। আমেরিকার আসন্ন নির্বাচনে যুযুধান রাজনৈতিক শিবিরের অন্যতম একটার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী তো এখন প্রচার করছেন-মনুষ্য-সৃষ্ট ভূ-উষ্ণায়ন আসলে একটা ধাপ্পাবাজি-চিনের স্বার্থরক্ষায় তৈরী। বহুদিন ধরেই আমেরিকার গোঁ চিন আর ভারতকে ছাড় দিয়ে ভূ-উষ্ণায়ন ঠেকানোর কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি (যেমন কিয়োটা চুক্তি) সফল হতে পারে না। সদ্যসমাপ্ত প্যারিস সম্মেলনে (COP-21) সেই মতই প্রতিফলিত হলো। কিন্তু, নির্বাচনে যদি গদি উল্টে যায় তখন কি আমেরিকা আবার ভোল বদলে বলবে—আমাদের কোন দায় নেই, আমরা মনুষ্যসৃষ্ট উষ্ণায়ন তত্ত্বটাই ভুল মনে করি। বিজ্ঞানীরাই তো বলছেন।

আমরা যারা দেশের সাধারণ মানুষের জন্য উপযুক্ত বিজ্ঞানের খোঁজে কিছু তালাশ করার, কিছু পথ হাঁটার প্রয়াস পেয়েছি, তারা যখন তর্ক-বিতর্ক করবো—আর সেটা তো করতেই হবে—তখন তো তিক্ততা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়! তবু তা এড়ানোও যায় না, কারণ, আমার বা আমাদেরও ভুল হতে পারে—মুখে বললেও প্রায়শই আমরা তা মানি না।

ফোনালাপ হলো যে বন্ধুটির সঙ্গে সেও দীর্ঘদিন ধরেই 'মানুষের জন্য বিজ্ঞান' করছে, তাদের পত্রিকাও খুবই জনপ্রিয় ছিল। অথচ যে সভার সূত্রে বন্ধু কুপিত সেই সভায় আলোচক শ্রোতা সবাইকে উত্তম নৈশ ভোজে আপ্যায়িত করা হয়েছিল। অংশগ্রহণকারীর মুখ থেকেই শুনেছি। পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছিল। উত্তম কাগজে সুমুদ্রিত পত্রিকাটি সবার মধ্যে বিতরণও করা হয়েছিল। ভূ-উষ্ণায়ণ নিয়ে দুই বিরুদ্ধ মতের প্রবন্ধই অবশ্য ছাপা হয়েছিল তাতে। দিল্লীর একটি এন জি ও'র সঙ্গে যৌথভাবেই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। যে পত্রিকা পাঠক-গ্রাহকদের চাঁদা এবং জনাকয়েকের গাঁটের কড়ির উপর নির্ভর করেই চলত, তার এই ধরণের আচরণে অবাক হয়েছিলাম, মনে হয়েছিল-বন্ধুরা একটা ভুল করে ফেলেছে বুঝি।

আর ভুল তো হয়ই। ভুল করা আমাদের অধিকার। বিজ্ঞানের যে কোন ইস্যুতে পেপারে-জার্নালে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতানৈক্য আছে জেনেও একটা মতকে স্বীকার করে দেশে দেশে চলে তার প্রয়োগ। কালক্রমে হয়তো কুফলও প্রকট হয়। সাধারণ মানুষের স্বার্থে যাঁরা বলেন লেখেন আন্দোলন করেন তাঁদেরও একটা অবস্থান ঠিক করে নিতে হয়। সে অবস্থান দুই যুযুধান প্রধান মতের একটাতে না হতেও পারে। কারণ সত্য তো সবসময় হয় এ-পক্ষে নয় ও পক্ষে থাকেনা, হয়তো তার অবস্থান কোন মধ্যবর্তী পরিসরে। এমনকি তার অবস্থান পাল্টে পাল্টেও যেতে পারে। যেতেই পারে, কারন বিভিন্ন দেশ-কাল-পরিবেশ-সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে চলে তার মিথস্ক্রিয়া। কোন নিরালম্ব বিমূর্ত ধারণামাত্র তো নয় মানুষ। বিজ্ঞান দিয়ে মানুষের উপকার করতে চাওয়া একটা সৎ-প্রেরণা ঠিকই, কিন্তু তার কোন বাঁধা সড়ক নেই, ফর্মূলায় ধরা দেয় না তা, তারও বাঁকে বাঁকে আছে ভুলের ফাঁদ, মতান্তর মনান্তর। এই তো কয়েকবছর আগে আমাদের পত্রিকার ('বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' বা বি ও বি) কাছে এলো এক লোভনীয় প্রস্তাব। পশ্চিমবঙ্গে এক বৃহৎ ও পরিকল্পিত স্বাস্থ্য-উপনগরী তৈরীতে নামছে একটি ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, অনাবাসী ভারতীয়রাই তার কুশীলব। পত্রিকার সমস্ত খরচ-খরচা তারা নিয়মিত দিতে চান। এমনকি অফিস-ভাড়া এবং একজন কর্মীর মাইনেও। আমরা যেমনভাবে চাই পত্রিকা চালাতে পারি, শুধু আঙ্গিকে একটু অদলবদল ঘটিয়ে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। মাঝে মধ্যে তাদের তরফে দু-একটি লেখা/রিপোর্ট ছাপতে হবে। তাদের বিজ্ঞাপন তো থাকবেই। অল্প কিছু আলোচনার পর প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করা হলো। সকলে একমত হলো যে আর যাই হোক টাকা ঢেলে বি ও বি'কে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। আমরা রুগ্ন এবং কূপমণ্ডুক হয়ে থাকার বা একেবারেই না থাকার পরোয়ানা জারি করলাম নিজেদের উপরেই।

এ ধরণের সহমত ব্যতিক্রমই বলতে হবে। বি ও বি'র চলার পথে বারে বারেই আমরা জড়িয়েছি বিতর্কে, সহযাত্রীদের মধ্যেও তৈরী হয়েছে মতভেদ-কখনও তীব্র, কখনও মৃদু, পথ আলাদা হয়ে গেছে কোন কোন ক্ষেত্রে। ফোনের বন্ধুকে ধন্যবাদ। তার অনেক অভিযোগই ফেলনা নয়। সে আমাকে প্ররোচিতই করল একটু আত্মানুসন্ধান করতে।

২. কোন পথে যে চলি

একেবারে গোড়ায়—সেই ১৯৭৭-৭৮ সালে একটা দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠেছিল। 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞাকর্মী সংস্থা' (Scientific Workers' form বা SWF) তখন

একটি সংগঠন। ছিল রীতিমত নির্বাচিত পরিচালন সমিতি, যেখানে নানা পদ ছিল। সদস্যরা ছিলেন, প্রায় সবাই—তরুণ 'বিজ্ঞানকর্মী'। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা গবেষণাগারের কর্মী বা গবেষক। সচেতনভাবেই বিজ্ঞানকর্মীর সংজ্ঞা ঠিক করা হয়েছিল, যাঁরাই বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহী বা উৎসাহী-যাতে বিজ্ঞানে প্রথাগত তালিম ছাড়াও যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে। সরকারী এবং প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগারগুলিতে অগণতান্ত্রিক পরিবেশ, তরুণ গবেষকদের অবহেলা হেনস্তা, কর্তৃপক্ষ এবং বিজ্ঞানীসহ সমস্ত কর্মীদের সম্পর্ক যেখানে ঘোষিত ভাবেই প্রভু-ভৃত্যের—এসবই সেসময় ছিল উত্তপ্ত আলোচনার বিষয়। দিল্লীর জাতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের (ICAR) তরুণ বিজ্ঞানী বিনোদ শা আত্মাহুতি দিয়ে এসব অভিযোগ তুলেছিলেন বছর কয়েক আগেই। আমাদের একাংশ চাইলো SWF বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের ভেতরের অবিচার অগণতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই-এর রাস্তায় চলুক। অন্য এক অংশ SWF-এর এই 'ট্রেড ইউনিয়ন' হয়ে ওঠায় সায় দিতে পারলোনা। তারা চাইলো বিজ্ঞান-সংস্কৃতির প্রচার প্রসারই SWF এর কর্মক্ষেত্র হোক। অনেক আলোচনা-বিতর্ক পেরিয়ে রফা হল একটা, দুধরণের কাজই চলতে থাকলো। কিন্তু অচিরেই প্রতিষ্ঠানগুলিতে দাবী দাওয়ার আন্দোলনের সংগঠন অন্য রূপ নিল-তৈরী হলো এক সহযোগী সংগঠন JACARI (Joint Action Commitee of Academic and Research Institutes) যেখানে, দেখা গেল, রাজ্যের শাসকগোষ্ঠীর প্রধান দলের প্রত্যক্ষ প্রভাব। সম্পর্ক ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর, অবশেষে ছিন্ন হয়ে গেল। বি ও বি ঘিরে রয়ে গেল বিজ্ঞান-সংস্কৃতির প্রবক্তারা, যারা মনে করেছিলেন কোনরকম প্রত্যক্ষ রাজনীতি-প্রভাব বিজ্ঞান-চর্চার, বিজ্ঞান-সংস্কৃতির পরিপন্থী; সত্যকে তা আড়াল করতে মদত দেয়।

আমাদের অনেকেরই দ্বিধাগ্রস্ততা ছিল, কিন্তু ক্রমশ JACARI প্রবল রাজনীতি প্রভাবিত হয়ে প্রথমে অতিসক্রিয় হলেও, বছর কয়েকের মধ্যেই তা স্তিমিত হয়ে গেল। বিজ্ঞান-গবেষণা ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিকতা তেমনই রইল, বরং সেসব আরও তীব্র ও প্রকট হলো। বিজ্ঞান-সংস্কৃতি—পন্থীরা ঢিলেঢালা খোলামেলা কিছু কাজ ও লেখালেখি নিয়ে কোনক্রমে ভেসে রইল।

৩. অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার

বিতর্ক কিন্তু পিছু ছাড়ল না। এবার এলো অপ্রত্যাশিত আর এক দিক থেকে। সেময় অনেক বিজ্ঞান ক্লাব, পত্রিকা, গোষ্ঠী মাথা তুলেছিল। বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, কুসংস্কার বিরোধিতা, সামাজিক ন্যায়, ধর্ম জাত-পাত ভিত্তিক ভেদাভেদ ও সংকীর্ণতার থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠছিল। অনুষ্ঠানে, আলোচনায় লেখাপত্রে। এর মধ্যে কুসংস্কার-বিরোধিতার একটা উচ্চসুর ছিল এই যে অশিক্ষিত অজ্ঞ মানুষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয় সহজেই। অলৌকিকতায় বিশ্বাস করে, তাবিজ-মাদুলি জলপড়া-তেলপড়ার আশ্রয় নেয়। ভুত পেত্নী ঠগ জুয়াচোরদের খপ্পড়ে পড়ে। যারা শিক্ষিত, বিশেষ করে বিজ্ঞানে শিক্ষিত, তাদের আছে সেই জ্ঞান ও যুক্তি যার সাহায্যে তারা ব্যাখ্যা করতে কপারেন এ ধরণের সমস্ত অলৌকিক অতিলৌকিক ঘটনার, উদ্ঘাটন করতে পারেন কার্য-কারণ সম্পর্ক, লোক-ঠকানো নানা কারসাজি প্রমাণ করে দিতে পারেন। এসব নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হতে লাগল। কোন কোন গোষ্ঠী অনুসন্ধানী দল নিয়ে গ্রামে গঞ্জে ছুটে যেতে লাগলেন। কখনও ভূত তাড়াতে বা ধরতে, কখনও বুজরুকদের পর্দা-ফাঁস করতে এবং অবশ্যই বেচারী অজ্ঞদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করতে। আমাদের কিন্তু এ ব্যাপারে অতি উৎসাহী হওয়াটা ভালো ঠেকছিলো না। শিক্ষার অভাবে বা বিজ্ঞান শিক্ষা না থাকলে যে মানুষ অযৌক্তিক হয়, কুসংস্কারগ্রস্ত হয়, না হলে হয় না— এটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলো না। বহু শিক্ষিত এবং বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষিত মানুষকে তো অহরহ আমরা দেখতে পাচ্ছি কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসাচ্ছন্ন। দারিদ্রজর্জরিত জীবনধাবণের ন্যূনতম উপকরণ বঞ্চিত মানুষদের অন্ধবিশ্বাসের 'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা' হাজির করেন তাঁরা। তাছাড়া, আমরা বিজ্ঞানী, উচ্চতর যুক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী, তাই 'ওদের' প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাতে পারি—এই মানসিকতাও একটা সংস্কার, যাকে কুসংস্কারই বলা যায়। কাউকে করুণা করার অধিকার আমাদের নেই।

চলল তুমুল ও দীর্ঘ বিতর্ক—কখনও কখনও তাপও উদ্গীরণ হয়েছে। ফসল হিসেবে বি ও বি'তে প্রকাশিত হল কয়েক কিস্তির 'সভ্য অন্ধবিশ্বাস'। সহযাত্রী অনেক ব্যক্তি, গোষ্ঠী, পত্রিকা বিরূপ হলো আমাদের প্রতি। যা টের পাওয়া গেছিল কিছু চিঠিপত্রে, বেশীটাই ফিস-ফিস প্রচারে। কিন্তু

ধীরে ধীরে হলেও কিছু পত্রপত্রিকায় এই বিতর্কের ইতিবাচক প্রভাবও পড়েছিল। অশিক্ষিতদের অন্ধবিশ্বাস—প্রসঙ্গে তাদের সুর একটু পাল্টেছিল, এবং অন্য নানা বিষয়ও তাদের আলোচ্য হয়ে উঠেছিল।

৪. পরমাণু-অস্ত্র বিদ্যুৎ

এসবের পাশাপাশিই চলছিল পরমাণু-বিদ্যুৎ নিয়ে আলোচনা। সেটাকে কেন্দ্র করেও বিতর্ক ধূমায়িত হলো।

১৯৭৪-এ পোখরাণে ভারতের পরীক্ষামূলক পরমাণু-বিস্ফোরণ থেকেই জাতীয় স্তরে এই বিষয় নিয়ে লেখালেখি হচ্ছিল। সরকারী স্তরে এর পর পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের বড়োসড়ো কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গেও পরমাণু-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কথা শোনা যাচ্ছিল।

১৯৪৫-এর হিরোসিমা-নাগাসাকির পর থেকেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের মধ্যেও এটা ছিল একটা হাতেগরম বিষয়। অনেক বিজ্ঞানী নিজেদের কাজকর্মের পরিণতি দেখে হতাশ ও বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৭৭-এ আমেরিকার থ্রি-মাইল আইল্যাণ্ডে পরমাণু চুল্লীর দুর্ঘটনা সে দেশে পরমাণু বিদ্যুতের প্রসারে বিরাট আঘাত আনে। আমাদের পত্রিকায় নিয়মিত এসব নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা চলছিল। ভূমধ্যসাগরীয় বিরল বসতির দ্বীপ বিকিনি-অ্যাটল-এ ১৯৫০-এর দশকে হাইড্রেজেন বোমার গোপন পরীক্ষার উপরও বিওবি'তে প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৮২'র ৬ আগস্ট হিরোসিমা দিবস পালন করা হল। উদ্যোক্তা 'গণবিজ্ঞান সমন্বয়' নামের নতুন এক মঞ্চ, যেখানে বহু ধরণের সংগঠন নিজ নিজ পরিচয় নিয়ে শান্তির লক্ষ্যে পরমাণু অস্ত্রের বিরোধিতায় মিছিল নিয়ে পদযাত্রা করে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ চত্বরে সমবেত হয়ে অনুষ্ঠান করল। গান্ধী পিস ফাউণ্ডেশনের পক্ষেও একটি বড়সড় দল এতে অংশগ্রহণ করেছিল। আমাদের SWF ঐ দিনই যাদবপুরের পিপলস সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রকাশ করল একটি ছোট্ট বই—না হিরোসিমা নাগাসাকি চাইনা। যতদূর জানি বাংলা ভাষায় এ ধরণের প্রথম বই ছিল এটি। পরমাণু-শক্তির ভয়ঙ্কর সব দিক নিয়ে তথ্যবহুল এত আলোচনাও সম্ভবত এর আগে বাংলাভাষায় হয়নি।

এই সব উদ্যোগের ফলে একটা বিতর্ক দানা বাঁধল পশ্চিমবঙ্গে। ইতিউতি বেশ কিছু আলোচনাসভার আয়োজন হতে লাগল। এবং মজার ব্যাপার, এইসব সভায়, দেখা গেল—আমরা-বিজ্ঞান আন্দোলনের সহযাত্রীরাই একে অপরের বিরুদ্ধে বলছি। SWF বি ও বি'র পক্ষে আমাদের বক্তব্যের সারকথা ছিল—পরমাণু বোমা-বা অস্ত্র তো নয়ই। এমনকি পরমাণু বিদ্যুৎ-ও চাইনা। কারণ, এতে ভারতের বিদ্যুৎ চাহিদা পুরণের কোন সম্ভাবনা তো নেই-ই, বরং বিদ্যুতের দোহাই পেড়ে পরমাণু বোমার মালমশলা হস্তগত করে ভারতও পরমাণু-অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় নেমে পড়তে পারে। এটা মোটেই শান্তি এবং উন্নয়নের সহায়ক নয়। দীর্ঘমেয়াদী ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয় দূষণ তো আছেই। ...অপরপক্ষে বন্ধু তার্কিকরা ভারতের পরমাণু-বিদ্যুতের পক্ষে সওয়াল করার সঙ্গে এও বলছিলেন যে পরমাণু অস্ত্র কার হাতে আছে সেটা বিবেচ্য। আমেরিকার মত অমানবিক-আগ্রাসী যুদ্ধবাজ দেশের হাতে পরমাণু অস্ত্র নিশ্চয়ই উদ্বেগের, কিন্তু শান্তি ও জনগণের উন্নতিকামী, বিশেষত সমাজতন্ত্রী দেশের হাতে তা থাকলে সেটা তেমন দুশ্চিন্তার নয়, বরং ভারসাম্যের প্রশ্নে সেটা কাম্যই।

কালক্রমে রাশিয়ায় চেনোবিল ঘটবে, জাপানে ফকুশিমা ভারত সরকার আবার পরীক্ষামূলক পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটাবে, আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরমাণু-বিদ্যুৎ কর্মসূচী নেবে এবং খোদ আমেরিকার সঙ্গেই পরমাণু শক্তির ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদন করবে, মহারাষ্ট্রের জৈতাপুর আর তামিলনাড়ুর কুডানকুলামের পরমাণু-বিদ্যুৎ-কেন্দ্র নিয়ে জনতার বিক্ষোভ ফেটে পড়বে, পশ্চিমবঙ্গে সরকারে আসীন বামফ্রন্ট রাজ্যে পরমাণু চুল্লির অনুমোদনে এগোবে পেছোবে, পূর্ব মেদিনীপুরে পরমাণু-চুল্লীর স্থাপনের বিরুদ্ধে জনরোষ আছড়ে পড়বে এবং এ রাজ্যেও পরমাণু বিদ্যুৎ বিরোধিতায় নতুন নতুন গোষ্ঠীর ব্যাপক মতৈক্য এবং সমাবেশ ঘটবে—এসব অনেক পরের ব্যাপার। কিন্তু সেদিন ১৯৮০'র দশক জুড়ে আমাদের অবস্থা অনেক রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি বিজ্ঞান-আন্দোলন সহযোগী অনেক বন্ধুর বিরূপ সমালোচনাই কুড়িয়েছিল। অসহিষ্ণুতা কিন্তু কোথাও মাত্রা ছাড়ায় নি।

৫. পরিবেশ শিল্পায়ন

একেবারে প্রায় শুরু থেকেই বি ও বি'র অন্যতম আলোচ্য বিষয় হিসেবে উঠে এসেছিল পরিবেশ। ১৯৮৪-৮৬

সময়কালে তা তীব্রতর হলো। ১৯৮৪'র ডিসেম্বরে ঘটলো ভূপাল-গ্যাসকাণ্ড, বিশ্বের ভয়ঙ্করতম রাসায়নিক বিপর্যয়। প্রাণহানি, বিকলাঙ্গতা, মানুষ ও অন্যান্য জীবের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি, মাটি-জল-পরিবেশের দীর্ঘস্থায়ী বিষ-দূষণ সব মিলিয়ে এক ঐতিহাসিক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা হল। মিছিল প্রতিবাদ-সভা পোস্টার প্রদর্শনী লেখালেখিতে বিভেদের অনেক প্রাচীর ভেঙে কলকাতা হয়ে উঠল অন্যতম ক্ষোভ-প্রতিবাদের কেন্দ্র।

দূরের এক ভিনরাজ্যের এই ঘটনা নিয়ে আমেরিকান কোম্পানি ইউনিয়ন কার্বাইডের বিরুদ্ধে অনেকে মিলে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া গেল, কিন্তু যখন ১৯৮৬ সালে সুন্দরবন নেটিফায়েড এরিয়ায় একটি রাসায়নিক সার কারখানার উদ্যোগের বিরোধিতা করে বিওবি-তে প্রবন্ধ প্রকাশ হল, আমরা স্থানীয় মানুষের প্রতিবাদে, তাদেরই আহ্বানে সামিল হলাম, তখন আর পাশে অন্য কাউকে পাওয়া গেল না। কিন্তু এসময়েই লক্ষ্মীকান্তপুরের বাসিন্দা সাহিত্যিক, নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক পোস্ট-অফিস কর্মী বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত আমাদের কাছে এলেন। বি ও বি-তে বেরোন প্রবন্ধ পড়ে তিনি আমাদের খুঁজে বের করলেন এবং আমাদের সহযোগিতা চাইলেন। অল্পদিনেই তিনি হয়ে উঠলেন আমাদের সকলের 'বিশুদ্ধদা', বিজ্ঞানে প্রথাগতভাবে প্রশিক্ষিত না হয়েই বিজ্ঞান ও তার সামাজিক প্রয়োগ নিয়ে আগ্রহী-উৎসাহী একজন 'বিজ্ঞানকর্মী', বিশুদ্ধ সংস্কৃতির কাজকর্মের মধ্য দিয়েই স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে প্রচার-চালালেন—কৃষকরা 'সুন্দরবন সার কারখানাকে' জমি বিক্রী করতে চাইলেন না। চাপ-হুমকির মুখেও তাঁরা অনড় রইলেন। 'সুন্দরবন সার কারখানা', ঐ নাম নিয়েই, জলপাইগুড়ি পাড়ি দিল। (সেখানেও স্থানীয় মানুষ মেনে নেননি, পুলিশের গুলিতে একজন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়। ডি. এমের অফিসে আয়োজিত জনশুনানীতে স্থানীয় বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংগঠনের সঙ্গে আমরাও হাজির হয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম। কয়েকবছর খুঁড়িয়ে চলে অবশেষে কারখানা উঠেই যায়। কিন্তু সেসব একটু অন্য কথা।)

সার কারখানার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন একদিকে যেমন ছিল বিজ্ঞান জানা আর বিজ্ঞান না জানা সচেতন মানুষদের একটা মেলবন্ধনের ঘটনা, অপরদিকে তেমনি এটাই বোধহয় এরাজ্যে প্রথম ঘটনা যেখানে স্পর্শকাতর পরিবেশে দূষণকারী শিল্প কারখানা চাপিয়ে দিয়ে উন্নয়ন করার 'সভ্য অন্ধবিশ্বাস'-কে প্রতিহত করলো। তখনও সংবাদপত্রে, পত্র-পত্রিকায় এই আন্দোলনকে 'উন্নয়ন বিরোধী' বলেই অভিহিত করা হয়েছিল।

আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় এইরকম সময়েই এক পুরনো বন্ধুর আবির্ভাব ঘটেছিল। অনেকদিন পর। নানাভাবে আমাদের কাছে জানালেন কিছু অনুযোগ, কিছু অভিযোগ। বললেন—আপনারা তো পরিবেশ নিয়ে আতঙ্কই ছড়াচ্ছেন। দূষণ ঘটাচ্ছে বলে চালু কারখানাও বন্ধের দাবী জানাচ্ছেন। কিন্তু বড্ড একপেশে হয়ে যাচ্ছেনা কি ব্যাপারগুলো? কারখানা বন্ধ হলে শ্রমিকদের পেটেই প্রথমে হাত পড়ে। তাদের কি দোষ, তারা যাবে কোথায়, খাবে কি?... আপনারা জানেন কিনা জানিনা, পরিবেশ-দূষণ-নিয়ন্ত্রণের নামে বহুজাতিক কোম্পানীরাই তো এখন বিশ্বজোড়া ব্যবসা ফেঁদে বসেছে, দূষণ নিরোধী যন্ত্রপাতি প্ল্যান্ট ইত্যাদিও এই বৃহৎ ব্যবসার অঙ্গ। আপনারা কি তাদের হয়েই ওকালতি করছেন না? দূষণের ফলে পরিবেশের, বিশেষত সুন্দরবনের মতো ইকোসিস্টেমের স্থায়ী ক্ষতি হলে তার পরিণাম যে আরও কত মারাত্মক হতে পারে তা বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু বন্ধু সেদিন তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। সেটা মোটেই অবাক হবার নয়, কারণ দূষণ-নিয়ন্ত্রণের সরকারী-সংস্থাগুলিও তো আজও এই দোদুল্যমানতায় ভুগছে।

প্রায় বিশ বছর পরে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম ঘিরে একই রকমের প্রশ্নের মুখে পড়ে সরকার দমন-পীড়নের পথ নিলে সর্বস্তরের মানুষের মিছিলে আমরা তো ছিলামই, দেখেছিলাম আমাদের সমালোচক বন্ধুদেরও অনেক মুখ, সেই বন্ধুও তাতে সামিল হয়েছিলেন দেখেছি।

৬. বিজ্ঞান আন্দোলন রাজনীতি

১৯৭০-এর দশকের শেষার্ধ থেকে, ১৯৮০'র দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ রাজ্যে এই যে নানা ক্রিয়াকলাপ বিজ্ঞানের নাম করে সামাজিক প্রগতির পালে হাওয়া লাগাতে চাইছিলো, স্থান-কাল-পাত্রের হেরফেরে তা কখনও বিজ্ঞানক্লাব আন্দোলন, কখনও গণবিজ্ঞান বা জনবিজ্ঞান বা লোকবিজ্ঞান আন্দোলন হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছিল। ঠিকমত বিচার করলে এগুলি নিশ্চয়ই সমার্থক নয়। কিন্তু আমরা তাদের মিলের জায়গাটা চিহ্নিত করতে

চাইলাম—সবগুলোকেই 'বিজ্ঞান-আন্দোলন' হিসেবে অভিহিত করে। বিচার বিশ্লেষণ বিতর্ক করে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা মোটেই নয়, তাই কখনও একই ব্যক্তির বক্তব্যে বা লেখায় একাধিক নামও উঠে আসতো। শহর কলকাতা থেকে একটু দূরে এইসব আন্দোলন শিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিল। কলকাতায় আবার বিশেষ বিশেষ কিছু আন্দোলন-উদ্যোগ-যেমন, বন্ধ কল-কারখানার শ্রমিকদের জন্য আন্দোলন, শিক্ষা-সংস্কার-প্রসার আন্দোলন, মানবাধিকার আন্দোলন ইত্যাদি বিজ্ঞান আন্দোলনের পরিপূরক হয়ে উঠছিলো। এইসব উদ্যোগই পৃথকভাবে মাথা তুলেছিল, পরে কখনও কারো কারো মধ্যে সংযোগ-আদানপ্রদান ঘটলেও তা ছিল বিক্ষিপ্ত। এদের সবার কাজেই পরিবেশের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে এবং ক্রমশ তা বাড়তি গুরুত্ব পেতে থাকে। এই সব কাজকর্মে সভা সমাবেশে উৎসাহী তরুণরা ক্রমশ বেশী সংখ্যায় অংশগ্রহণ করতে থাকে।

এরাজ্যে বামফ্রন্ট শাসনের প্রথমদিকে এইসব উদ্যোগ কিছুটা প্রশ্রয় পেয়েছিল বলেই আমার মনে হয়, কিন্তু আশির দশকের মাঝামাঝি মানুষের মুখে এমনকি সংবাদপত্রেও ইতি-উতি এই মর্মে আলোচনা উঁকি মারতে থাকে যে, বিজ্ঞান ক্লাব বা বিজ্ঞান আন্দোলন ঘিরে তরুণদের মধ্যে আগ্রহ বাড়লেও রাজনীতি থেকে তারা মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। কোন কোন রাজনৈতিক দলের কাছে এটা মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠলো এবং অচিরেই বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল রাজ্যের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক ফ্রন্টের অন্যতম প্রধান শরিকদলের আশীর্বাদপুষ্ট এক নতুন বিজ্ঞান সংগঠন—পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। বিজ্ঞান আন্দোলনের এই নতুন মঞ্চ সাংগঠনিক ক্ষমতা-দক্ষতায় ধারে ভারে প্রচারে সকলকে টেক্কা দিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। বিচ্ছিন্ন কিন্তু স্বাধীন ও স্বতস্ফূর্ত গোষ্ঠীগুলোর অনেকে আর্থিক অনুদান এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধার হাতছানিতে সাড়া দিয়ে মঞ্চের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিল, নতুন নতুন মঞ্চানুগামী ইউনিট গড়ে উঠল, কিন্তু পালের হাওয়া যে একেবারে কেড়ে নিল, এমন কথা বলা যাবে না। জনপ্রিয় বিজ্ঞানকে দলীয় কর্মসূচীর অঙ্গ করে রাজনৈতিক সাফল্যের প্রচেষ্টায় অবশ্য এটিই একমাত্র উদাহরণ নয়। আরও একটি বামদল পরে এ পথে হাঁটতে শুরু করে।

বিজ্ঞানকে রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসারী করতে চাইলে কি ফল হয়, বিশ্বের ইতিহাসে তার নজির আছে। আমরা দেখেছি, টেস্ট টিউব বেবীর অন্যতম আবিষ্কর্তা ডা: সুভাষ মুখার্জির হেনস্তা এবং সরকারী কমিটি দ্বারা তাঁর আবিষ্কারকে যাচাই করার হীন প্রয়াসকে। সেসময়ে বিওবি'র পক্ষ থেকে আমরা ডা: মুখার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম এবং কমিটি গড়ে বিজ্ঞানের সত্যাসত্য যাচাই-প্রচেষ্টার নিন্দাও করা হয়েছিল পত্রিকার পাতায়।

আলোচ্য ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-আন্দোলনকে পক্ষপুটে নিয়ে রাজনৈতিক প্রাণশক্তিতে জোয়ার আনার প্রচেষ্টার সামগ্রিক ফল কি হল তা জানবার বোঝবার সময় বোধহয় এখনও আসেনি। ভবিষ্যতে লেখা ইতিহাসে যদি তা ধরা দেয় কখনও।

৭. বিজ্ঞান আন্দোলন সংগঠন

বিজ্ঞান আন্দোলনের বিভিন্ন স্বাধীন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কোন সাংগঠনিক যোগসূত্র না থাকলেও তাদের মধ্যে কিছু কিছু আলোচনা আদানপ্রদান ছিলই। মাঝে মধ্যেই তাকে সংহত ও সংগ্রথিত করে একটি সংগঠনের মধ্যে আনার চিন্তা উঁকি মেরেছে এখানে ওখানে। আশির দশকেই মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায় SWF এবং আরো কয়েকটি সংগঠনের উদ্যোগে আমরা দুটো পৃথক জাঠা করেছিলাম, প্রতিটি প্রায় দশদিন ধরে। পোস্টার স্লোগান গান নিয়ে পথ হেঁটে কোথাও থেমে কিছু প্রদর্শন, গান বক্তৃতা করা হতো। রাজনৈতিক মিছিল দেখতে অভ্যস্ত গ্রাম-গঞ্জবাসী বা পথচারী নতুন ধরণের মিছিল তার স্লোগান আর গান শুনে থমকে যেত। লিফলেটও বিলি করা হতো। দিনশেষে পূর্বনির্ধারিত জায়গায় হতো সভা, নাটক। স্থানীয় আগ্রহী মানুষদের সঙ্গে আলোচনা। স্থানীয় কোন গোষ্ঠীই সহায়তা করত, কোন স্কুলে, বা ক্লাবে জুটত আশ্রয়। রাস্তায় চলতে চলতে বা আড্ডায় বসে তৈরী হয়েছিল কিছু গানও—সকলের অংশগ্রহণে মুখে মুখে। সেগুলিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত চলমান কর্মসূচীতে। বর্ধমানে জাঠা করার সময় আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন কেরল থেকে আসা বি. প্রেমানন্দ। তিনি ছিলেন Begone Godmen-বই খ্যাত লেখক আব্রাহাম কভুর-এর শিষ্য। তাঁর সহায়তায়, তাঁর কাছ থেকে শিখে 'অলৌকিক নয় ম্যাজিক' নাম দিয়ে প্রদর্শনীও করতে শুরু করল কিছু উৎসাহী তরুণ ছাত্র।

এসবের ফলে সংগঠন করার দাবী উঠছিল একটা। অন্যদিকে আবার 'উৎস মানুষ' পত্রিকা ঘিরে জেলায় জেলায় গড়ে ওঠা কিছু পাঠচক্রও আরও সক্রিয় হতে চাইছিলো, কেউ কেউ সংগঠন করার অনুরোধ জানাচ্ছিল। এসব কিছুর ফলশ্রুতিতে একটি সমন্বয়কারী সংগঠনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে ১৯৮৭ সালে কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত হল একটি দুদিনের সম্মেলন এবং আমরা বিজ্ঞান আন্দোলনের সংগঠন হওয়া দরকার কিনা বা হলে তা কেমন হওয়া উচিত সেই প্রশ্নে তীব্র বিতর্কে জড়িয়ে পড়লাম।

কল্যাণী সম্মেলনের আমন্ত্রণকারী SWF -বিওবি হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল একটা যৌথ উদ্যোগ। মূলত দক্ষিণবঙ্গেরই গোষ্ঠীরা এতে যোগ দিয়েছিল, প্রায় পঁচিশটি গোষ্ঠীর তরফে দুশো জন ছিল অংশগ্রহণকারী। সম্মেলনে উপস্থিত অধিকাংশ গোষ্ঠী মিলে দ্বিতীয় দিনের শেষলগ্নে একটি 'গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র' গড়ার প্রস্তাব রাখলো। প্রস্তাবে বলা হল, একটি পরিচালন সমিতি তৈরী হোক গোষ্ঠীগুলোর ভোটদানের মাধ্যমে। কেন্দ্র পরিচালনায় প্রত্যেক গোষ্ঠী চাঁদা দেবে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর নতুন পরিচালন সমিতি আসবে ইত্যাদি। SWF -এর পক্ষে এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। আমাদের বক্তব্য ছিল—এ ধরণের সংগঠনের যে সব নজির আমাদের সামনে রয়েছে তাতে আমাদের মনে হয়, কোন কেন্দ্র-শাখা বিভাজিত পদাধিকার-বিন্যস্ত সংগঠন বিজ্ঞান-সংস্কৃতিকে ধারণ ও পালন করতে পারে না। এ ধরণের সংগঠনে ক্ষমতার বলয় তৈরী হয়ে যায়, দায়দায়িত্ব ভাগ হয়ে গিয়ে শাখাগুলির স্বাধীন ও স্বতস্ফূর্ত অস্তিত্ব বিপন্ন হয়, কেন্দ্র থেকে পথনির্দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। আমরা স্বীকার করে নিলাম, ঠিক কি ধরণের সংগঠন বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা প্রসারের অনুকুল হবে তা আমাদের এই মুহূর্তে জানা নেই। আমরা বরং প্রয়োজন-ভিত্তিক আলোচনার সুবিধার্থে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা করে উঠতে পারি কিনা সেটাই আপাতত স্থির করি। (মোবাইল যুগ তখনও শুরু হয়নি)। 'উৎস মানুষ' ও শেষ পর্যন্ত আমাদের যুক্তি মেনে নিয়ে সরে দাঁড়ালো। উপস্থিত অন্যরা মিলে তৈরী করলো 'গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র'।

৮. কূপমণ্ডুকতার আন্দোলন

শুরুতে SWF -এর একটি রীতিমত নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলী থাকত। তাতে সভাপতি সম্পাদক কোষাধ্যক্ষ ইত্যাদি পদও ছিল। ছিল কয়েকটি উপসমিতিও - যেমন পত্রিকা উপসমিতি, আন্দোলন উপসমিতি ইত্যাদি। আশির দশকের মাঝামাঝি এসে নির্বাচন মুখ থুবেড় পড়লো। আমাদের সক্রিয়তা তুঙ্গে হওয়া সত্বেও পদে ইচ্ছুক নয় প্রায় কেউ। অতএব সবাই মিলে মনোনীত করা হতে থাকলো সভাপতি, সম্পাদক ইত্যাদি কয়েকজনকে, যাতে কাগজপত্রে সইসাবুদ করা যায়।

হবে না-ই বা কেন? আমরা যে বিজ্ঞান-সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে গিয়ে ক্রমশ বেশী করে কূপমণ্ডুকতারই চর্চা করে গেলাম।

আমাদেব কোন স্থাবর সম্পত্তি তৈরী হয়নি, কোন স্থায়ী অফিসও না। ছিল না কোন নির্দিষ্ট আয়ের সংস্থান। পত্রিকার পাঠক-গ্রাহকদের কাছ থেকে সাহায্য, কিছু বিজ্ঞাপন এবং কাজভিত্তিক নিজেদের মধ্যে চাঁদা তোলা—এভাবেই চলেছে।

শুরুতে দ্বিভাষিক ছিল বি ও বি। বাংলা প্রবন্ধের ইংরেজী সারাংশ আর ইংরেজী প্রবন্ধের বাংলা সারাংশ দেওয়া হতো। কিন্তু তা বেশীদিন টেকে নি। অচিরেই ইংরেজী প্রবন্ধ অমিল হলো, ইংরেজী সারাংশও বন্ধ করে দেওয়া হল। লেখা পাবার জন্য প্রতিষ্ঠিত লেখক/বিজ্ঞানীদের পিছু ধাওয়া করা হয়নি শুরু থেকেই। বিজ্ঞানের বিষয় নিছক সহজ করে লেখা বা বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল না। আবার অবলা-অবোধদের জন্য সহজপাচ্য জল মেশানো বিজ্ঞান-প্রবন্ধ পরিবেশনেও আমরা উৎসাহী ছিলাম না। একটা নতুন ধাঁচের পাঠক লেখক-যারা চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় সব খাদ্যই তৃপ্তি করে খেতে ও দিতে পারেন তাই তৈরী আমাদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। বি ও বি-তে তাই প্রায় সব লেখকরাই নতুন। লেখকদের পদ বা উচ্চতা নিয়ে কোন মাথাব্যথা ছিল না, সে পরিচয় তুলেও ধরা হত না। লেখাই লেখকের পরিচয়—এই নীতিই আঁকড়ে থেকেছি আমরা। তবুও বি ও বি-কে ঘিরে একটা ছোট লেখকগোষ্ঠী তৈরী হয়েছে, বি ও বি'র পাঠকরা তা জানেন। এ নিয়ে পাঠক-সমালোচনাও কম ছিল না। বলা হতো বি ও বি'র লেখা কঠিন দুর্বোধ্য, নিজেদের জন্য নিজেদের লেখা। বিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত নন অথচ যথেষ্ট সচেতন শিক্ষিত মানুষও লেখা দেবার অনুরোধে বলে উঠেছেন—উরে বাবা আমি তো বিজ্ঞানের কিছু জানি না। অনেক চেষ্টায় এ অবস্থার

সামান্য উন্নতি হয়েছে পরে। অতএব, আমরা ইংরেজী বইপত্র পড়লেও, আমেরিকায় প্রকাশিত 'Science for the People' (Sftp) পত্রিকার সৌজন্য কপি নিয়মিত আমাদের কাছে এলেও, আমরা লিখি বাংলায়, বলি তর্ক করি বাংলাতেই। মানুষের কাছে পৌঁছুতে চেয়েছি বলেই বাংলা ভাষা আঁকড়ে থেকেছি। আমাদের অলিখিত মেজাজ যেন ছিল, খোলা রেখে সব জানলা, ঘরটাকে তুই সামলা।

ভিন রাজ্যে বা ভিনদেশে প্রবাসী দু-চারজন শুভানুধ্যায়ী অনেকদিন ধরেই অনুযোগ করছে-কী যে করেন আপনারা, ছাপানো পত্রিকা আজকাল আর কেউ পড়ে না, ই-ম্যাগাজিন করুন, ইংরেজীতেও লিখুন, ওয়েবসাইট করুন, ফেসবুক টুইটারে যান, না হলে কে জানবে আপনাদের কথা? আমরা আমাদের আলসেমি-কে আস্কারা দিয়ে বলি—কোন বাণী কোন সাফল্যের কথা বলবো দুনিয়ার মানুষকে ডেকে ডেকে? আর তাই আমাদের আলোচনা মধ্যে এসেছে খরা বন্যা ভূমিকম্প, মানসিক সমস্যা, হোমিওপ্যাথি, বিজ্ঞান শিক্ষার গোড়াপত্তন, লৌকিক ও চিরাচরিত পরিবেশ ভাবনা, পূর্ব কলকাতা ও অন্যত্র জলাভূমির সংকট এবং আরও কত কি। কোন কোনটা নিয়ে বিতর্কও হয়েছে তীব্র, কিন্তু কলরব হয়েছে বলতে পারি না।

৯. চিরবিদায় নেওয়া সাথীরা

আমাদের এই কূপমণ্ডুকতার চর্চায় যারা তাঁদের অনেকটা উজাড় করে দিয়েছিলেন, যাদের কাছে পেয়ে, সাথী পেয়ে ব্যক্তি হিসেবে আমরা আনন্দ পেয়েছি, কিছু করার উৎসাহ পেয়েছি, এমনকি সংগ্রহ করেছি বেঁচে থাকার রসদও, এবং আজ যারা আমাদের কাছে অতীত হয়ে গেছেন, তেমন কয়েকজনের কথা এই সুযোগে স্মরণ করা যাক।

আমাদের পথ চলা শুরুর বছর কয়েক পরেই এসেছিল সত্য-সত্যব্রত কর—শুধু এলো না,ক যেন ধূমকেতুর মত উদয় হল আর বছর কয়েকের মধ্যেই ধূমকেতুর মতই বিদায় নিল—চিরবিদায়। প্রথা আর স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে অন্তহীন প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা ছিল সত্যর। বেশ কিছু তরুণকে আকৃষ্ট করেছিল সে। না, ভাঙনের ডাক দিয়ে নয়, বরং ধারাবাহিক বিতর্কের মধ্যে দিয়ে ভালোমন্দ সত্যাসত্য বুঝে নিয়ে কাজ করার ডাক দিয়ে। গানে গল্পে আড্ডায় প্রাণবন্ত খোসমেজাজী সত্য হৃদযন্ত্রের দুরারোগ্য ব্যাধিতে অকালে ঝরে পড়ল, তার অনেক বন্ধুকে কাঁদিয়ে।

তরুণ ডা: রণজিৎ ঘোষের কর্মক্ষেত্র আলাদা ছিল, তবু কোটনিস মেমোরিয়াল কমিটি এবং জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে উঠছিল তার মাধ্যমে। বিপুল খরচ করে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে ডা: ঘোষের 'সফল' বোন-ম্যারো প্রতিস্থাপন হলেও তা স্থায়ী সুফল দিল না।

ভারতের দরিদ্র মানুষকে গিনিপিগ বানিয়ে নতুন অপ্রমাণিত ওষুধের গণপরীক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের বিষ-নজরে পড়া ও অপদস্থ হওয়া ডা: সুখময় ভট্টাচার্যও ছিলেন জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের আর এক মুখ। তাঁর সঙ্গে গড়ে উঠেছিল আমাদের সহজ উজ্জীবক সম্পর্ক। কিন্তু তাঁর ছিল দৃষ্টির স্থায়ী সমস্যা। হঠাৎ-ই স্বাভাবিকতা-চ্যুত একমাত্র সন্তানকে ঘিরে গভীর দুশ্চিন্তা ডা. ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত জীবনকে একেবারেই অস্থির করে তোলে, অন্ধকার নেমে আসে জীবনে। তার মধ্যেও সবার জন্য স্বাস্থ্য, বিশেষত মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে অনেক কিছু করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর লেখা জনস্বাস্থ্য বিষয়ক এবং বয়:সন্ধির সমস্যা বিষয়ক দুটি বই আজও আমাদের অনেকের কাছেই আছে। অভিজ্ঞ হয়ে ওঠার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে করুণ মৃত্যু হল তাঁর, অপমৃত্যু হলো তাঁর উদ্যোগগুলিরও।

মূলত সাংস্কৃতিক কর্মী বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত আমাদের বিজ্ঞান আন্দোলনে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা-বলা যায় অপরিহার্যতা প্রমাণ করেছিলেন। প্রায় সত্তর বছর বয়সেও তিনি ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সচল ও সম্পূর্ণ কর্মক্ষম। তাঁর কিছু বিজ্ঞান-রচনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলো মানুষের কাছে যেতে হলে রচনার প্রসাদগুণ কেমন হওয়া দরকার। ....তাঁরই হাত ধরে আমাদের কাছে এসেছিল নিশীথ অধিকারি। চমৎকার ছড়া লিখত পরিবেশ স্বাস্থ্য শিক্ষা নিয়ে। নিতান্ত যুবা বয়সেই নিশীথ চলে গেছে বিশুদ্ধারও প্রায় এক দশক আগেই।

অধীত ডাক্তারিবিদ্যাকে পণ্য হতে না দেবার দীক্ষায় দীক্ষিত স্বপন-ডা: স্বপন দাসের অকালমৃত্যু হল ২০১৫'র গোড়াতেই। সুস্থ-সবল হাস্যোজ্জ্বল ডাক্তারের দেহে সাতান্ন বছর বয়সে কোথা থেকে কিভাবে বাসা বেঁধেছিল দুরারোগ্য রক্তব্যাধি—অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া-তা কে জানে? বছর দুই ধরে ব্যাধির সঙ্গে কঠিন লড়াই করে হার মানল হার-না-মানা স্বপন। শান্ত স্থিতধী বিচারশীল স্বপন মাঝপথে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এক বিরাট অবলম্বন হয়ে উঠেছিল।

বি ও বি এবং বিজ্ঞান আন্দোলনের শুরু থেকেই যিনি ছিলেন অন্যতম চালিকাশক্তি এবং প্রেরণার উৎস সেই মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার-সর্বপ্রিয় মণিদা-২০১৫'র মাঝামাঝি প্রয়াত হলেন। আমাদের ঘরাণার বিজ্ঞান আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলেও তিনি থামতে চাননি। অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা

উজাড় করে ভাবীকালের জন্য রেখে গেছেন কিছু ফসল-অমূল্য কিছু প্রবন্ধ যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং কয়েকটি বই। তাঁর 'পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড' বইটি প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট (NBT), মাত্রই ২০১৪ সালে।

বছরের শেষদিকে প্রয়াত হলেন অধ্যাপক বিনায়ক দত্তরায়। সলতে পাকানোর সময় এবং SWF- বি ও বি'র যাত্রাশুরুর সময় তিনি ছিলেন অন্যতম পথপ্রদর্শক।

বিজ্ঞান-আন্দোলনের যে ধারাটির কথা আমি বলছি তার মরা গাঙে আর একবার জোয়ার এলো সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন পর্বে। এবার স্রোত একটু বিপরীত। সাহা ইনস্টিটিউটের মত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী অভি দত্তমজুমদারকে হঠাৎ-ই আমরা আবিষ্কার করলাম যেন এক নবীন বিজ্ঞানকর্মী হিসেবে যার মধ্যে যেন আমাদের আরব্ধ সব বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়েছে। যুক্তি ও তথ্যের বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটতো অভির লেখায় ও বক্তৃতায়। সরাসরি পাঠক-শ্রোতার মর্মে প্রবেশ করে 'অপ-উন্নয়নের' প্রকরণগুলিকে চিনিয়ে দিতে পারতো। সকলে মিলে মিশে কাজ করতে করতেই আলোচনা-বিতর্ক চালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস যেন গড়ে উঠেছিল। হঠাৎ পাওয়া সেই আত্মার আত্মীয় অভি'রও মাত্র ৪৫ বছর বয়সে অকালপ্রয়াণ ঘটল ২০১৩-তে। বিজ্ঞান-আন্দোলনের নবরূপে উত্তরণের একটা আশার প্রদীপও যেন দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

'উৎস মানুষ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা—সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের একটি চিকিৎসক সমিতির সংগঠক ও ড্রাগ অ্যাকশন ফোরামের অন্যতম কর্ণধার ডা: সুজিত দাসের কথাও এ প্রসঙ্গে ভোলার নয়। তাঁরা বিজ্ঞান আন্দোলনের ধারাকে বিভিন্নভাবে পুষ্ট করেছিলেন। স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিরাট ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদের সংস্থা ও বিওবি'র প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার হাত সর্বদা প্রসারিত থাকতো।

১০. ত্রুটি ঘাটতি : একটি অভিমত

কূপমণ্ডুকতার চর্চাও কিন্তু আমরা ঠিকমত করতে পারিনি— ফাঁক-ফোঁকড় ছিল বিস্তর। আমি অবশ্য আমাদের (SWF-বিওবি) কথাই বলতে পারি।

ত্রুটি-ঘাটতির কথা বলার আগে একটা কথা স্পষ্ট করা দরকার। আমরা কি কতকগুলো অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে লম্ফ-ঝম্প করেছি, আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি? মণিদার স্মরণ সভাতেই প্রশ্নটা উঠেছিল। আমাদের চোখের সামনেই ভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে, ঘটে চলেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন বৃহত্তর অংশ দেশবাসীর জীবনে সুখসমৃদ্ধি, আনন্দ ও আলোক বয়ে আনেনি। এই পরিবর্তনের হাতিয়ার তো উন্নয়ন বিজ্ঞান প্রযুক্তি! অথচ বিজ্ঞান প্রযুক্তি উন্নয়নই, বলা যায় দেশের গরিষ্ঠাংশ মানুষের জীবনকে গভীর থেকে গভীরতর খাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এমনকি যারা আর্থিক দিক থেকে এই পরিবর্তনের কিছু সুফল-সুবিধার অলস উপভোক্তা, তাদেরও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খুব আশাবাদী হবার উপায় নেই। এই প্রেক্ষিতে পরিবেশ, ভূ-উষ্ণায়ণ ও জলবায়ু পরিবর্তন, জিন-বদলানো খাদ্য, জলাভূমি জঙ্গল পাহাড় উপকূলের সুরক্ষা ও ইকোলজি সম্মত ব্যবহার কোন বিষয়টা উপেক্ষণীয়? আবার যে দেশ যে সমাজে এই সব সংক্রান্ত শিক্ষা-গবেষণা-প্রযুক্তি-উপকরণকে বাণিজ্য-উন্নয়নের হাতিয়ার করা হবে সেই সমাজের ইতিহাস, সংস্কৃতি পরিবেশ মানসিকতাও কি সমানভাবে বিবেচনা-গবেষণার যোগ্য নয়? আমাদের বিজ্ঞান আন্দোলনে কমবেশি পরিসর জুড়ে তো এইসব বিষয়ই ছিল।

এই নিরিখেই কয়েকটি ত্রুটি ঘাটতির কথা তুলব।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে মোটের উপর নগর-শহর-কেন্দ্রিকতা অতিক্রম করতে পারেনি এই আন্দোলন। পারেনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নারী এবং তরুণদের আকৃষ্ট করতে।

এগুলি এতই সার্বিক ও সাধারণ যে 'আমাদের আন্দোলনের' ত্রুটি না বলে বরং বলা উচিত আমরাও এই ত্রুটি-মুক্ত হবার কোন পন্থা আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়েছি। নারীরা ঘরমুখী এবং তরুণরা মোহাচ্ছন্ন বা উদাসীন—এই ক্লিশে হয়ে যাওয়া কুযুক্তির মূলে আছে, অন্য অনেকের মত, আমাদেরও অক্ষমতা।

বিজ্ঞান আন্দোলনে দুটি বিশেষ শব্দ খুব গুরুত্ব পেয়েছিল—যুক্তিযুক্ততা এবং বিজ্ঞানমনস্কতা। যুক্তি দিয়ে যা বুঝি না তা মানিনা-বলার মধ্যে যে একটা গোঁয়ার্তুমিও থাকতে পারে তা মনে না রাখায় আন্দোলন কখনও

কোথাও খেলো হয়েছে। আমার মনে হয়, যুক্তির প্রকারভেদ চারটি—অযুক্তি, কুযুক্তি, যুক্তি আর প্রযুক্তি। অযুক্তি কুযুক্তি প্রায়শই যুক্তির জায়গা দখল করে বিতর্ককে কুতর্কে পরিণত করে। আর প্রযুক্তিকে আমরা যুক্তি হিসেবে গ্রাহ্যই করতে শিখিনি। সে কথায় আসছি একটু পরে। বিজ্ঞানমনস্কতার দোহাই পেড়ে যদি বলা যায় নিউটন বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন না, ছিলেন না জগদীশচন্দ্র বা প্রফুল্লচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ কেউই, তাহলে 'বিজ্ঞানবাদ'ও একটা রাজনৈতিক মতবাদ হয়ে যায়; দেশকালের প্রেক্ষিতের বিশ্লেষণ বিচার করার অক্ষমতাই সূচিত করে তা।

সব ত্রুটি সব ঘাটতি আসলে একটিমাত্র অভাব বা ঘাটতির দিকে ইঙ্গিত করে—তা হল বিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিবাচক দিকগুলির চর্চা-অনুশীলনের জন্য একটা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে না পারা। এমন একটি প্রতিষ্ঠানই পারতো—

—আন্দোলনকে সংহত করে ভাবীকালে পৌঁছে দিতে

—সমাজের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী ও ধারাবাহিক সংলাপে লিপ্ত হতে এবং তা চালিয়ে যেতে।

—আন্দোলন-জাত জ্ঞান ও তথ্যকে যৌথ অনুশীলনের মধ্যে ফেলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগার মত কোন কর্মসূচীতে উত্তীর্ণ হতে।

—স্বাধীনতা-সৃজনশীলতা যাতে উৎসাহ পায় তেমন একটি সাংগঠনিক কাঠামোর খোঁজে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে।

—চালু প্রতিষ্ঠানাদির অমানবিক, অগণতান্ত্রিক ও পরিবেশ বিনাশী ভূমিকাকে, যত ক্ষুদ্রভাবেই হোক, চ্যালেঞ্জ জানাতে।

অবশ্য চারপাশের চাপে সেরকম একটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ ধ্বংস বা বিপথচালিত হবার সম্ভাবনা যে থাকে না তা নয়, কিন্তু পরীক্ষাটা যে শুরুই করা যায়নি, এই সত্য তাতে মিথ্যে হয়ে যায় না।

কেন আমরা আন্দোলনকে প্রাতিষ্ঠানিক অনুশীলনের মধ্যে আনতে পারলাম না, তার কয়েকটি কারণ, পশ্চাৎ-ভাবনা হিসেবে যা আমার মনে হয়েছে, উল্লেখ করলে বুঝতে একটু সুবিধেই হবে।

চারপাশের চালু রাজনৈতিক সংগঠন এবং এমনকি বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির চেহারা চরিত্র দেখে আমরা শঙ্কিত বোধ করেছিলাম। সেগুলি যে স্বাধীন স্বতস্ফূর্ত সৃজনশীলতাকে ধারণ করতে পারে না, সেই বোঝায় আমাদের ভুল ছিল না।

গতানুগতিকতার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বিরোধিতার স্বতস্ফূর্ত বুদ্ধিদীপ্ত বিদ্যুৎ চমকিত ঝলকে আমরা এবং বিভ্রান্ত হয়েছি। আমেরিকার সিয়াটল শহরের স্বতস্ফূর্ত বিশাল জমায়েতের পরিবেশ-অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাক লাগানো সম্মিলিত বিক্ষোভ প্রতিবাদ, ফ্রান্সের পরমাণু-শক্তি বিরোধী আন্দোলন, এমনকি চিন ও তিব্বতের কিছু কিছু আন্দোলন—এসবই তার উদাহরণ। সোশ্যাল-মিডিয়ায়, ওয়েবসাইটে কোন কোন পণ্ডিত তো এমনও বলেছেন যে পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ আন্দোলনের স্বাধীন উদ্যোগগুলির জালের অভিঘাতেই বিশ্বপরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে। একটি সংগঠনের আওতায় এদের আনার কথা ভাবার দরকার নেই। আবার ইউরোপের বিশেষত জার্মানির গ্রীন পার্টিগুলির মুখ থুবড়ে পড়াও হয়তো আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে মানসিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।

বিজ্ঞান আন্দোলনকে আমরা কোন সাংগঠনিক ছত্রছায়ায় আনতে চাইনি সেটা ভুল হয়েছিল বলে আমার মনে হয় না, কিন্তু স্বাধীন বিক্ষিপ্ত উদ্যোগগুলির পারস্পরিকতার মধ্য দিয়ে উপযুক্ত একটি সংগঠনে পৌঁছনোর পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও তো আমরা নামতে পারিনি। আমরা মনে রাখিনি যে সংগঠন-প্রতিষ্ঠান গড়ে যৌথ কাজ ও চিন্তার জন্যই মানুষ আদিম বন্যাবস্থা থেকে আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা আমাদের দেখিয়ে দিতে পারতো (অথচ দেয়নি) যে যতদিন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা (SWF) সক্রিয় ছিল, আমরা কিছু কাজ করেছি—সীমিত কিছু সমীক্ষা প্রচারের উপকরণ, মানুষের সঙ্গে সংলাপ ইত্যাদি—ততদিন আমাদের জীবনীশক্তি স্ফূর্তি পেয়েছিল, সংস্থার কাজে যেই ঢিলে পড়ল, জীবনীশক্তিও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকল।

আমরা তো কেউ জান-প্রাণ লড়িয়ে বিজ্ঞান

আন্দোলনে নামিনি, আমাদের রুটি-রুজির সংস্থান নিয়েও তত দুশ্চিন্তা ছিল না, কাজেই আমরা সহজেই ভুলে যেতে পেরেছিলাম যে চিন্তা ও কাজের মেলবন্ধন ঘটাতে না পারলে চিন্তাস্রোত বদ্ধ জলাশয়ের মতো দূষিত হয়ে পড়ে, যুক্তি ক্রমাগত শাণিত হয় না, নতুন যুক্তি আবিষ্কার হয় না। খোলামন আলোচনা এবং বিতর্ক ছাড়া বিজ্ঞানও অন্ধবিশ্বাস হয়ে উঠতে পারে। সে যেন অক্সিজেনহীন বাতাস, জীবের পক্ষে বিষবৎ। তেমনি আবার সংস্কার বিশ্বাস অভ্যাসকেও যদি অবিরাম বিতর্কের পরিমণ্ডলে বিবর্তিত হতে দেওয়া যেতো, তাহলে সেগুলিও স্থানু অন্ধবিশ্বাস অবিজ্ঞান হয়তো থাকতে পারতো না।

সমসাময়িক আন্দোলনের ফসলগুলিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের জন্য গ্রথিত করে লভ্য করে রাখায় ভারতীয়রা, বিশেষ করে বাঙালিরা, চিরকালই অপটু। উত্তরাধিকার হিসেবে বর্তানো অপটুতা আমরাও কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

১০. অতঃ কিম?

প্রয়াত মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের সঙ্গে এসব নিয়ে আমার অনেক আলোচনা ও তর্ক হয়েছিল বেশ কয়েক দফা। কয়েকটি সিদ্ধান্তে আমরা সহমত হতে পেরেছিলাম। অন্যদের বিবেচনার জন্য সেগুলি পেশ করলাম:

(ক) আইডিয়া-অনুপ্রেরণার জন্য আমরা যতটা পশ্চিমের দিকে মুখ করে থেকেছি ততটা পূবের দিকে তাকাইনি। নিজেদের অতীত বিশেষত নবজাগরণের সময়টাকেও আমরা ভালোভাবে জানতে বুঝতে চেষ্টা করিনি। এই সময়টাকে বিজ্ঞানের দিক থেকে খুঁটিয়ে দেখার যথেষ্ট অবকাশ ও প্রয়োজন আছে।

(খ) কোন বিকল্পই আকাশ থেকে পড়ে না। উল্টে দিলেও সবকিছু রাতারাতি পাল্টে যায় না। অনুশীলনের মধ্য দিয়েই বিকল্প বেরিয়ে আসা সম্ভব।

(গ) সময়াভাব মানুষের বাড়তেই থাকবে। নিজ গণ্ডীর বাইরে পা ফেলার মত মানুষ চিরকালই কম ছিল, ভবিষ্যতে আরও কমবে বই বাড়বে না।

(ঘ) আগে বিদ্যা যতটা কেতাবী ছিল, জীবন থেকে যতটা বিচ্ছিন্ন ছিল, এখন পরিবেশ একটা সেতুবন্ধ তৈরি করে বিচ্ছিন্নতা কাটানোর সুযোগ এনে দিয়েছে।

(ঙ) দৈনন্দিন জীবনে মৌলিক চাহিদা-পূরণে প্রযুক্তি-প্রযুক্তির উপকারী ভূমিকার অভিজ্ঞতা যদি মানুষের না হয়, তবে তাদের কাছে যুক্তি বিজ্ঞান এসব কোন অর্থ বহন করে না। প্রযুক্তি নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা বিতর্ক করেছি, কিন্তু ব্যবহারিক যুক্তি হিসেবে প্রযুক্তিকে তুলে ধরতে পারিনি।

(চ) স্বাস্থ্যক্ষেত্রের মত, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, পানীয় জল, জ্বালানি, পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও উপযুক্ত প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার ঘটিয়ে ন্যূনতম কিছু পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

(ছ) তার জন্য অবশ্যই চাই যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। এটাই হতে পারতো বিজ্ঞান আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি এবং হাতিয়ার।

(জ) উপরে বলা কাজ ও প্রতিষ্ঠান তরুণদের আকর্ষণ করবেই। তারুণ্যের থাকে প্রকৃত জিজ্ঞাসা এবং স্বপ্ন। তাদের জিজ্ঞাসা তৃপ্ত করার পন্থার হদিশ দেওয়া এবং স্বপ্নকে বাস্তবসম্মত সমষ্টিগত ও সামাজিক অভিমুখে চালিত করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার চেষ্টাও হতে পারে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের মধ্য দিয়েই।

(ঝ) বিজ্ঞান—সেবা'র এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতি ও ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন।

(ঞ) বর্তমান অস্থায় সরকার এ কাজে এগোবে না, কারণ এটা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির পরিপন্থী। অনেক মানুষের অল্প অল্প দানে (সময়, শ্রম, চেষ্টা, দক্ষতা, অর্থ, উপকরণ, জমি, বাড়ি ইত্যাদি) সমৃদ্ধ এই প্রতিষ্ঠানকে স্বাবলম্বী হবার লক্ষ্যে চলতে হবে।

(ট) বিজ্ঞান-পরিষেবার কর্মসূচী সুনির্দিষ্ট করতে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই ভূমিকা আছে। শুধু-বিজ্ঞান-শিক্ষিতদের কাজ নয় এটা। বস্তুত

প্রতিষ্ঠান এঁদের পরিপূরক জ্ঞান ও দক্ষতার সম্মিলন ও সমন্বয়ে সহায়তা করতে পারে।

(ঠ) কালক্রমে এরকম প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান সমাজ পরিবেশ, ইতিহাস সংস্কৃতি শিল্প (Art and Industry) এইসবের আন্তঃসম্পর্ক উন্মোচনে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

(ড) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে এ ধরনের কাজের পথিকৃৎ গণ্য করা যায়। কিন্তু তাঁর দেখানো পথ ও পদ্ধতিকে অনুসরণ করে এইসব ক্ষেত্রে চর্চা করার কোন প্রতিষ্ঠান আজও নেই।

(ঢ) পরিবর্তিত বাস্তব অবস্থার কিছু সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার যেমন করতে হবে, তেমনি ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি-পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং অপ-উন্নয়ন বয়ে আনা প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাদিকেও চিহ্নিত করতে হবে।

(ণ) যে কোন সমাজেই চিরায়ত জ্ঞান প্রজ্ঞা ও প্রযুক্তি'র সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও প্রযুক্তির সামঞ্জস্য বিধান ও মেলবন্ধন ঘটানো সম্ভব কেবলমাত্র খোলামনের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার মাধ্যমেই।

মণিদার দৃঢ় অভিমত ছিল যে বিজ্ঞান শিক্ষার অঙ্গ হিসেবেই সুচিন্তিত কিছু ধরনের পণ্য ও পরিষেবা ছোট আকারে তৈরি ও বিপণন করে কিছু উপার্জন করা সম্ভব এবং তা বিজ্ঞান শিক্ষাকেও অর্থবহ করে তুলতে পারে। অনেকদিন ধরে অনেক স্তরে এই নিয়ে দরবার করে করে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার দিশাহীনতায় হতাশা বোধ করেন। জীবনের উপান্তে নতুন এই উপলব্ধির সূত্রে বিজ্ঞান-আন্দোলনের ফসল হিসেবে কল্যাণীতে নিজ বাসভবনেই একাংশে পত্তন করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড সোসাইটি' (APCRISS) নামের একটি প্রতিষ্ঠান; একটি অছি-পরিষদ (ট্রাস্টি বোর্ড) গঠন করে রেজিস্ট্রেশনও করা হয়েছিল। কিন্তু ইন্সটিটিউটকে কর্মপথে সক্রিয় করে তোলার তোড়জোড়ের মধ্যেই তাঁর আকস্মিক প্রয়াণ ঘটলো।

আমরা যারা বিজ্ঞান আন্দোলনে ছিলাম তাঁর সহযাত্রী, সেই আমাদের সকলকেই ঠিক করতে হবে আমরা কি এরকম প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার মধ্য দিয়ে আমাদের আন্দোলন-অভিজ্ঞতাকে নবরূপ দেবার প্রয়াস পাবো। নাকি সকলে গলা মিলিয়ে বলবো—'Science Movement is Dead, Long Live Science Movement!'

[রচনাটি লেখকের ব্যক্তিগত উপলব্ধি। নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। আশাকরি তথ্যের দিক থেকে স্মৃতি খুব বড়োরকমভাবে আমাকে বিভ্রান্ত করেনি। 'বিজ্ঞান আন্দোলনে' অংশগ্রহণকারী অন্যদেরও আহ্বান জানাই তাঁদের অভিজ্ঞতা—লিখতে। তাতে যদি একটা সামগ্রিক ইতিহাস সংগ্রথিত হয়।]

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর বন্ধুদের কাছে

শুভেন্দু দাশগুপ্ত
(suvendu.dg@gmail.com)

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকা/সংগঠনের সদস্যদের, বন্ধুদের, সহযোগী, সমর্থকদের আড্ডায় গিয়েছিলাম এই ক'দিন আগে খড়দহে, গঙ্গার পাড়ে। অনেকের সঙ্গে অনেকদিন বাদে দেখা হলো, আড্ডা হলো, পুরনো দিনের কথা হলো। ভালো লাগলো মন খারাপ হলো।

বয়স বাড়লে যা হয়, হঠাৎ হঠাৎ করে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যায়।

তখন নকশালবাড়ি আন্দোলন থেকে আপাতত ফিরে আসা। ফিরে এসে অন্য অন্য আন্দোলনে থাকা, থাকতে থাকা, থেকে যাওয়া। অধিকার আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন, নারী আন্দোলন, তৃতীয় লিঙ্গ আন্দোলন, জনস্বাস্থ্য আন্দোলন, জনশিক্ষা আন্দোলন, গণবিজ্ঞান আন্দোলন। এমন ভাগে ভাগ করলাম বটে, কাজে তেমনটি ছিল না। বিষয় অনুযায়ী বিজ্ঞান আন্দোলন ও পরিবেশ আন্দোলন মিলে গিয়েছিল। জনস্বাস্থ্য আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন ও বিজ্ঞান আন্দোলন মিশে গিয়েছিল। এমন ভাবেই অন্য অন্য আন্দোলন।

বয়স বাড়ছে। স্মৃতির সাথে বন্ধুতা কমে কমে আসছে। যতটুকু মনে পড়ে। তখন জনবিজ্ঞান আন্দোলন গণবিজ্ঞান আন্দোলন, বিজ্ঞান আন্দোলনের পরিসরে চলে এসেছিল। কসংস্কার বিরোধি আন্দোলন, আনবিক শক্তি বিরোধিতা, বড় বাঁধ ছোট বাঁধ তর্ক, ভূপাল গ্যাস কাণ্ড, পরিবেশ দূষণ, জলাভূমি রক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, বিদেশি প্রযুক্তি, ধর্ম, বন্যা, এমনতর সব বিষয়। তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন অঞ্চলে বিজ্ঞান সংগঠন, সায়েন্স ক্লাব, তার মধ্যে একটি সায়েন্টিফিক ওয়ারকারস ফোরাম। প্রকাশিত হয়েছিল অনেক বিজ্ঞান পত্রিকা। বাংলা ভাষায় তার মধ্যে একটি 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী'। অনুষ্ঠিত হতো বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা। তার মধ্যে একটি বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর আড্ডা। নানান বিষয়ে আলোচনা, তক্কো, কর্মসূচি, লেখা পাঠ, সমীক্ষা, তদন্ত কত কি। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও জুটে গিয়েছিলাম। কেন কিভাবে এতদিন বাদে আর মনে নেই। তাদের সঙ্গেই আবার দেখা খড়দহে গঙ্গারধারে। একটা মনে আছে। তখন আমরা প্রথমে অর্থনীতির, পরে কলাবিদ্যার জন্য অন্য শাস্ত্রের ছাত্ররা বাংলায় একটা পত্রিকা বের করতাম, পত্রিকা ঘিরে একটা সংগঠন বানিয়েছিলাম। 'অন্য অর্থ'। অর্থনীতির কয়েকটা বিষয় ছিল যা বিজ্ঞানের বিষয়। এমনই একটা বিষয় নিয়ে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর অভিজিৎ (লাহিড়ী) আর অন্য অর্থর আমি একসাথে কাজ করেছিলাম। বিদেশি প্রযুক্তির বিরুদ্ধতায় স্বদেশি প্রযুক্তির সন্ধান। তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহে আমরা গিয়েছিলাম সিক্কিতে সার গবেষণা কেন্দ্রে। বাঁকুড়ার গ্রামে বিজ্ঞানে গান্ধীবাদী তাত্বিক ও কর্মী সতীশ দাশগুপ্তর আশ্রমে। পরবর্তীকালে যখন প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলো, অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রের অনুরোধে অভিজিৎ আর আমি মিলে বামফ্রন্ট সরকারের প্রযুক্তিনীতি বানিয়ে দিয়েছিলাম। যদিও তা প্রয়োগ করা হয়নি।

ঠিক এই জায়গা থেকেই কয়েকটি কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছে। এতদিন বাদে। খড়দার আড্ডা থেকে ফেরার পর। বিজ্ঞান আন্দোলন শুধু বিজ্ঞানের ছাত্র, গবেষক, শিক্ষক, বিজ্ঞান সংস্থার কর্মীদের মধ্যে আটকে ছিল। সেটাই স্বাভাবিক ভাবা হয়েছিল। অথচ অর্থনীতির অনেক বিষয় বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া বোঝাই যাবে না। আবার বিজ্ঞানের অনেক বিষয় রাজনীতি শাস্ত্র ও ইতিহাস বিদ্যা ছাড়া পুরোটা ধরা যাবে না। কিন্তু বিজ্ঞানকর্মীরা রাজনীতিশাস্ত্র কর্মী এবং ইতিহাসবিদ্যাকর্মীদের কাছে যেয়ে উঠতে পারেনি, কিংবা তাদেরকে ডেকে নিতে পারেনি। আমি বোধহয় ঠিক বলছি। অথচ এই কবছর আগে নয়াচরে প্রস্তাবিত রাসায়নিক কারখানার বিরুদ্ধে আমরা বিজ্ঞানের মানুষজন আর অর্থনীতির লোকজন একসঙ্গে লেখাপড়া আলোচনা প্রতিবাদ করলাম।

এই বিষয়টাকে আর একটু এগিয়ে নিই। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর আলোচনার একটা বিষয় ছিল প্রযুক্তি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্ক। প্রযুক্তির কত ভাগ, বিদেশি প্রযুক্তি, স্বদেশি প্রযুক্তি, বড়ো প্রযুক্তি, ছোট প্রযুক্তি, আধুনিক প্রযুক্তি, লোক প্রযুক্তি, যথাযথ প্রযুক্তি, শ্রমসহায়ক প্রযুক্তি, শ্রমউচ্ছেদ প্রযুক্তি, সহায়ক প্রযুক্তি, ক্ষতিকারক প্রযুক্তি এমন নানা বর্গ। এই বিষয়টা একদিকে যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়, অন্যদিকে তেমনি অর্থনীতি ও ইতিহাসের বিষয়, এবং রাজনীতিরও। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর পাতায় এই বিষয় নিয়ে অনেকবার আলোচনা হয়েছে। তর্ক হয়েছে। এই জায়গাটায় অন্য কথা বলার জন্য আমি একটু অন্য জায়গায় যাচ্ছি। কেন কিভাবে মনে নেই, আমাকে একটা কাজ করতে হয়েছিল তখনকার বোম্বাইতে সিমেন্স কারখানার শ্রমিকদের জন্য। সম্ভবত: আমার এক বোম্বাইবাসী বান্ধবীর সূত্রে কারখানার ইউনিয়নের অনুরোধে। ওরা প্রধানত: জানতে চেয়েছিলেন বহুজাতিক সংস্থা সিমেন্স জার্মানির সঙ্গে ওদের কারখানা সিমেন্স ইণ্ডিয়ার সম্পর্কের ধরণ। এই জানতে চাওয়া ওদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্য। শ্রমিকদের লড়াইয়ের চেহারা, চরিত্র ঠিক করার জন্য। কাজ শুরু করার পর শ্রমিকদের কাছে শিখেছিলাম বিদেশি প্রযুক্তির ধরণ, প্রযুক্তি-পুঁজি সম্পর্ক, প্রযুক্তি- শ্রম সম্পর্ক, যন্ত্র-শ্রমিক সম্পর্কে প্রযুক্তির ভূমিকা, কারখানায় শ্রমবন্টনে প্রযুক্তি ব্যবহারের ধরণ এমন সব বিষয়। আমি অর্থনীতির ছাত্র। বিজ্ঞানের নই। সাথে একজন বিজ্ঞানচর্চায় থাকা বন্ধু থাকা দরকার ছিল। একটা বিষয় বুঝেছিলাম। আমরা বিজ্ঞান/প্রযুক্তি নিয়ে আলাপ আলোচনায় যতটা এবং যেভাবে বুঝে থাকি, শ্রমিকরা অন্যভাবে বুঝে থাকে। কোথাও একটা বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চর্চায় যারা তাদের সাথে শ্রমিকদের দেখা হওয়া, কথা হওয়ার দরকার ছিল। হয়নি। আমার জানায় হয়নি। ওদেরকে লিখে জমা দেবার সময় আমিও কোনও বিজ্ঞানী/প্রযুক্তিবিদ বন্ধুদের কাছে যাইনি। আমি ভুল করেছি। লেখার সময় সাহায্য করেছিল বরং আমার বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ক্লাসের ছাত্র দীপংকর। পুঁজির তরফটা বোঝার জন্য।

এই কাজটি শেষ করে জমা দেবার পর হিন্দুস্থান লিভারের শ্রমিকরা বললেন ওদের জন্য এমন একটি কাজ করে দিতে। বয়স হওয়াতে অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছি, কিন্তু সেদিনের কথাটি মনে থেকে গেছে। আমি তখন বোম্বাইতে আমার এক প্রাক্তন ছাত্র পার্থর বাড়িতে। হিন্দুস্থান লিভারের শ্রমিক প্রতিনিধিরা দেখা করার জন্য আমাকে একটা জায়গা আর সময় বলে দিলেন। আমি পার্থকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম। আমার কাছে ওরা কি চাইছেন, সেটার ভূমিকায় ওরা একটা দীর্ঘ আলোচনা করলেন। কি ছিল না সেই আলোচনায়, ওদের কথায়। বহুজাতিক সংস্থা ইউনিলিভারের সঙ্গে ভারতীয় সংস্থা হিন্দুস্থান লিভারের সম্পর্ক, অর্থনীতিক সম্পর্ক, পুঁজির সম্পর্ক, প্রশাসনিক সম্পর্ক এবং প্রযুক্তিগত সম্পর্ক। এবং যখন প্রযুক্তিগত সম্পর্ক বোঝাচ্ছে, আমি মনে মনে ভাবছি কেন একজন বিজ্ঞানী/ প্রযুক্তিবিদ বন্ধু আমার সাথে নেই, থাকলে কত সুবিধা হতো।

হিন্দুস্তান লিভারের এই শ্রমিকরাই পরে প্রযুক্তির বিষয়টাকে অন্যভাবে কাজে লাগিয়েছিল। পুঁজির প্রযুক্তির বিরুদ্ধে শ্রমের প্রযুক্তি হিসাবে। হিন্দুস্থান লিভারে ধর্মঘটের সময় শ্রমিকরা নিজেদের প্রযুক্তি জ্ঞানে কারখানার বাইরে সস্তায় সাবান বানিয়ে বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করেছিল। এবং দেখিয়েছিল প্রযুক্তি একটি রাজনৈতিক বিষয়। এবং এই বিষয়টি বিজ্ঞান, প্রয়োগিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি একটি রাজনীতিক বিষয় এটা তেমন ভাবে আমাদের বিজ্ঞান চর্চায়, গণবিজ্ঞান চর্চায় তেমন ভাবে আসেনি।

এই কথাটি আবার নতুন করে বোধ হলো গত বছর বন্ধ কারখানা নিয়ে কাজ করতে করতে। বেশ কয়েকটি বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে বসেছি কথা বলতে। দীর্ঘ সময়ের আলোচনায় শ্রমিকরা বলেছেন, বুঝিয়েছেন কারখানায় উৎপাদন ও শ্রমিক নিয়োগে প্রযুক্তির ভূমিকা। তারা আলোচনা করে, উদাহরণ দিয়ে আমায় বুঝিয়েছেন প্রযুক্তি, প্রযুক্তির ধরণ, প্রযুক্তি বদল, যন্ত্র, যন্ত্রের চরিত্র এমনসব দিয়েই তারা বুঝতে পারতেন, পুঁজির, পুঁজিপতির, কারখানা মালিকদের উদ্দেশ্য, ইচ্ছা, মনোভাব, কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার আভাস, ইঙ্গিত। তাদের প্রযুক্তি জ্ঞান নিয়ে তারা ট্রেডইউনিয়ন নেতাদের মানে রাজনীতিক দলের নেতাদের মানে সরকারের নেতাদের বুঝিয়েছেন, বোঝাতে চেয়েছেন।

কিন্তু এরা বোঝেনি। তাই শ্রমিক আন্দোলনে, বন্ধ কারখানার শ্রমিক আন্দোলনে যতটা অর্থনীতিক বিষয়কে সামনে আনা হয়েছে ততটা বিজ্ঞানের বিষয়কে, প্রযুক্তির বিষয়কে সামনে আনা যায়নি। বন্ধ কারখানার আন্দোলনের পাশে বিজ্ঞান চর্চায়, প্রযুক্তিচর্চায় থাকা মানুষজনকে আনা যায়নি। তাদেরকে আনা যায়নি, তারাও আসেননি। বিজ্ঞানচর্চায়, প্রযুক্তিচর্চায় পুঁজি, শ্রম, পুঁজির ক্ষমতা, পুঁজি-শ্রম দ্বন্দ্ব, সংঘাত এমন সব বিষয় তেমন জায়গা করে নিতে পারেনি। গণবিজ্ঞান আন্দোলন আর শ্রমিক আন্দোলন, পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন নিজেদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ করে উঠতে পারেনি তেমনভাবে।

আমি যখন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর বন্ধুদের সাথে প্রথম দিকে, তখন আমাদের রাজনীতি ভাবনায় আমাদের প্রতিপক্ষ রাষ্ট্র। আমাদের লেখা, আমাদের আলোচনা, আমাদের সমাবেশ, আমাদের বিরোধিতা, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বলতে রাষ্ট্রিয় নীতি, বিজ্ঞাননীতি, প্রযুক্তিনীতি, বিজ্ঞান শিক্ষা নীতি, রাষ্ট্রিয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান প্রকল্প, বিজ্ঞান নির্ভর প্রকল্প এসকলের বিরুদ্ধে। আমি বোধহয় ভুল বলছি না। এতকাল বাদে স্মৃতির উপর ভরসা রাখা যাচ্ছেনা। যদি ভুল হয় তাই আগবাড়িয়ে ক্ষমা চেয়ে রাখি। বন্ধুদের কাছে ক্ষমা চাওয়া আর বন্ধুদের কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া বন্ধুতার দাবির মধ্যেই পড়ে। বিজ্ঞান আন্দোলন, গণবিজ্ঞান আন্দোলন যতটা রাষ্ট্রের বিরোধিতা, রাষ্ট্রিয় প্রকল্পের বিরোধিতা করেছে, ততটা পুঁজির বিরোধিতা, সংস্থাপুঁজির প্রকল্পের বিরোধিতায় জোরদার হতে পারেনি।

এখন অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, সমাজে, সংস্কৃতিতে পুঁজির, সংস্থাপুঁজির, পুঁজিবাদের আধিপত্য। আমাদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ এখন পুঁজিবাদ। আজকে আমাদের ভাবনায়, তর্কে, আলোচনায়, লেখায়, সমাবেশে এই প্রতিপক্ষের বিরোধিতা, বিরুদ্ধতার সময়। বিজ্ঞান আন্দোলনে, গণবিজ্ঞান আন্দোলনের বেলাতেও কথাটি সত্যি।

আর একটা বিষয় আমাকে ভাবায়। বন্ধ কারখানা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে সেটি, সেই কথাটি আবার মনে হলো। বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নিই। আমার যতটা মনে পড়ে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চায় থাকা আমার বন্ধুরা, প্রতিবাদী বন্ধুরা যতটা কৃষি নিয়ে, পরিবেশ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে, সমাবেশ করে, প্রতিবাদে সামিল হয়, ততটা কারখানা নিয়ে, প্রযুক্তি নিয়ে, শ্রমিক নিয়ে, উৎপাদন নিয়ে, শ্রম নিয়ে, শিল্পপুঁজি, প্রযুক্তি পুঁজি নিয়ে ভাবেনি। আমার ভুল হতে পারে, আমায় ক্ষমা চাওয়ার, মার্জনা ভিক্ষা করার পরিধিটা বাড়িয়ে দিচ্ছি। অথচ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং পুঁজি, শ্রম, উৎপাদন সরাসরি যুক্ত। ছোট একটা উদাহরণ দিই। কানোরিয়া চটকলের আন্দোলনের বাইরে বন্ধকারখানার আন্দোলন আর বিজ্ঞান আন্দোলন তেমন একটা হাতে হাত ধরতে পারলো না। শ্রমিক আন্দোলনে তেমন একটা পাশে থাকতে পারলো না। অথচ পুঁজিবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ শ্রমিক, শ্রমিক শ্রেণী।

আমার বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর বন্ধুরা যখন এতটা এগোতে দিয়েছে, সাহস করে আর একটু এগোই। বিজ্ঞান আন্দোলনে, গণবিজ্ঞান আন্দোলনে শ্রেণী বিষয়টি খুব বেশি আলোচিত হয়েনি। অথচ বিজ্ঞানের, ফলিত বিজ্ঞানের, প্রযুক্তির, বিজ্ঞান ভাবনার, বিজ্ঞান চর্চার, একটি 'ক্ষমতা' আছে, ক্ষমতা প্রকল্প আছে, ক্ষমতা প্রয়োগ আছে, অতএব একটি শ্রেণী 'আছে। এবং সুতরাং 'শ্রেণী দ্বন্দ্ব' আছে। আমাদের আলোচনায় এই শ্রেণী দ্বন্দ্ব বিষয়টি তেমন ভাবে আলোচিত হয়নি। আমরা বিজ্ঞান আলোচনা করেছি প্রধানত: একটি শ্রেণীনিরপেক্ষ বিষয় হিসাবে। এমনভাবে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের লেখায়, তর্কে, সমাবেশে। এমন ভাবেই আজকে পুঁজিবাদের এমন সামগ্রিক আধিপত্যে আমরা বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীরা আমাদের অবস্থান বোঝায় দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছি। আমরা বন্ধুরা শ্রেণীগত অবস্থানে 'মধ্যবিত্ত'। আজকে মধ্যবিত্ত পুঁজিবাদের আকর্ষণে, আওতায় সামাজিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে, রাজনীতিকভাবে। এই নতুন মধ্যবিত্ততায় আমরা মধ্যবিত্ত বিজ্ঞান আন্দোলন কর্মীরা কোথায়, কিভাবে এমনটি নিয়ে একবার বসলে কেমন হয়।

খড়দহের আড্ডা থেকে বাড়ি ফিরে কথাগুলি মনে হলো, লিখে ফেললাম এই বোধে, অনুভবে—অনেক কাল বাদে দেখা হওয়াতেও, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানর্কমীর বন্ধুরা আমাকে এখনও ভালবাসে। অতএব এমন লেখার প্রশ্রয় তাদের কাছে পাবোই।

কিছু প্রশ্ন

অনিন্দ্য রুদ্র
(rudraanindya@hotmail.com)

১

প্রথমেই একটা সহজ সত্যিকথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো। সেটা হল আমি বিজ্ঞান আন্দোলনের লোক নই। যাঁরা বিজ্ঞানকর্মী, প্রাণপাত করে মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করেন আমি দূর থেকে তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখি কিন্তু তাঁদের থেকে একটু দূরে দূরেই থাকি। কেননা যেসব তথাকথিত অজ্ঞানতা তাঁরা তাড়ানোর চেষ্টা করেন, তার বেশ কয়েকটি আমার মধ্যেও আছে। ফলে তাঁদের দলে ভিড়ি কিভাবে?

কিন্তু একজন সামাজিক মানুষ হিসাবে আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে। এই প্রশ্নগুলো আমার মতে বিজ্ঞান আন্দোলন সম্বন্ধেও যেমন সত্যি আবার অন্য যে কোনো 'ভালো' কাজের ক্ষেত্রেও সত্যি। এই সুযোগে বরং সেই প্রশ্নগুলোকেই একটু তোলা যাক। সত্যি কথা বলতে কি এই প্রশ্নগুলোর অধিকাংশরই উত্তর আমার কাছেও জানা নেই। কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্রে এগুলোর যে আলোচনা হওয়া এবং উত্তর খোঁজার দরকার সেটা মনে করি।

২

কয়েকজন মানুষ প্রচুর পরিশ্রম করে একটা পত্রিকা প্রকাশ করেন। শুধু নিজেদের কিছু মামুলি গদ্য, পদ্য, ঢুকিয়ে দিয়ে লেখক হবার উদ্দেশ্যে ছোটো বেলায় মানুষ যেমন পত্রিকা প্রকাশ করে, সেইরকম পত্রিকার কথা বলছি না, একটা মহৎ কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণসাধনের জন্য প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর কথা বলছি। যেমন এই 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকাটির কথাই ধরা যাক। যতই অনিয়মিত ও স্বল্পায়তন হোক না কেন, উদ্দেশ্যর মহত্ব নিয়ে কি কোনও সংশয় থাকতে পারে? এইরকম পত্র পত্রিকা শুধু গণবিজ্ঞান আন্দোলন নিয়ে কেন, শিল্প, সাহিত্য, সমাজ, ইতিহাস বা দর্শনের মতো মানুষের সংগে সম্পৃক্ত, যেকোন বিষয় নিয়েই প্রকাশিত হয়। যতই এলেবেলে খেলালিখি করিনা কেন, অনেকদিন ধরেই যেহেতু একটু আধটু লিখতে চেষ্টা করছি এবং মূলত: এই জাতীয় অন্যধারার পত্রিকাতেই লিখে থাকি। তাই জানি কিছু মানুষের কি প্রভূত পরিমাণ নিষ্ঠা, শ্রম এবং আন্তরিকতা এই উদ্যোগগুলোর সংগে মিশে থাকে। ব্যবসায়িক সাফল্য তো অনেক দূরের কথা, সেসবের এঁরা কেউ তোয়াক্কাও করেন না। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের খরচাটুকুও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওঠে না। নিজেদের যাঁর যা পেশা, সেটাও প্রায় চৌপট হবার জোগাড় হয়। আজ প্রেসে দৌড়োও তো কাল বিজ্ঞাপনের জন্য এর ওর কাছে হাত কচলাও। পরশু লেখার জন্য তাগাদা দাও। তার ওপর প্রুফ দ্যাখো। দোকানে দোকানে বই পৌঁছে দাও। এটা করো, সেটা করো, হাজারো কাজ। এই কাজগুলো এই মানুষজনরা করেন এবং হাসিমুখে, আনন্দের সংগে। ব্যক্তিগত আর্থিক বা অন্যান্য ক্ষতি স্বীকার করেই করেন। কেন করেন? কেননা তাঁদের একটাই উদ্দেশ্য মানুষের ভাবনার জগতে, চিন্তার জগতে পৌঁছোনো এবং প্রশ্ন তোলা। আরও মানুষ, আরও বেশী করে মানুষ তাঁদের পত্রিকা, লেখা পড়ুক এবং তা তাদের আলোড়িত করুক, নাড়া দিক—এর থেকে বেশী কিছু তাঁরা চান কি?

কিন্তু এখানেই কিছু প্রশ্ন থেকে যায়।

মানতে যতই কষ্ট হোক না কেন, এই পত্রিকাগুলোর প্রচার সংখ্যা কিন্তু কখনই খুব একটা বেশী হয় না। শেষ পর্যন্ত, সব চেষ্টার পরেও কটা মানুষের কাছে এগুলো পৌঁছোয়? সবচেয়ে বড় কথা এই যে পৌঁচচ্ছে না এর কারণ কিন্তু এটা নয় যে লেখার মান বা গুণ খারাপ, মূল কারণটা একেবারেই অর্থনীতি সংক্রান্ত। আর পাঁচটা বিষয়ের মতো বই বা পত্রিকার বিপনণেও মূল চালিকা শক্তি বাজার এবং সেটাও তারই হাতে থাকে যার কাছে যত বেশী টাকা, ক্ষমতা এবং লোকবল আছে। বড় কাগজগুলোর কাছে এর সবগুলোই আছে। ফলে তারা হু হু করে লোকের ঘরে ঘরে

চলে যাচ্ছে আর আপনার ছোটো পত্রিকাটি এত চমৎকার হওয়া সত্ত্বেও তেমনভাবে লোকের কাছে পৌঁছতেই পারছে না।

এর সংগে গায়ে গায়ে লেগে থাকা আর একটা সমস্যাও আছে। সেটা হল বিস্তারের সমস্যা। এই পত্রিকাগুলোর অধিকাংশই এক একটা গোষ্ঠী বা গ্রুপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যাঁরা লেখেন, তাঁরাই পড়েন, আবার তাঁরাই আলোচনা করেন। আমি আপনার পত্রিকায় লিখি, আপনি আমার পত্রিকায় লেখেন। সন্দেহ নেই আপনি এবং আমি দুজনেই খুব রুচিসম্পন্ন, বিদগ্ধ মানুষ, কিন্তু যাঁদের কাছে এই বক্তব্যগুলো সবচেয়ে বেশী করে পৌঁছন দরকার, সেইসব অসংখ্য আম জনতা, সাধারণ মানুষের কাছে এই পত্রিকাগুলো কি পৌঁছচ্ছে? পাঠক ভিত্তি কি বাড়ছে? এই প্রশ্নটা খুব জরুরী হয়ে পড়ছে।

যে মানুষটি বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকায় লেখেন, গ্রাহক হন বা লেখা নিয়ে আলোচনা করেন, তাঁর কি কুসংস্কার, অপবিজ্ঞান বা অন্ধবিশ্বাস কতটা ক্ষতিকর সেটা নতুন করে জানার দরকার আছে? আর থাকলেও তা এই লেখা পড়ে দূর হবে কি? অথচ যাঁদের এটা সবচেয়ে বেশী করে দরকার সেই সব মানুষরা কি এইসব বই পড়েন? বা পড়লেও ধাক্কা খান? বাড়ির মাসিমা, কাকিমা, দিদিমারা? পাড়ার বৌদি? ও বাড়ীর ক্লাস টেনে পড়া ছেলেটা বা মেয়েটা? সদ্য কলেজে ঢোকা তরুণটি? তাদেরকেও কিভাবে এই পাঠক বৃত্তের মধ্যে আনা যায় সেটা সবচেয়ে বেশী করে ভাবতে হবে। যে ভাষায় এইসব পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা হয় সেটা স্ব স্ব ক্ষেত্রে চর্চারত মানুষদের বৌদ্ধিক আলোচনার জন্য খুবই উপযোগী সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই ভাষা দিয়ে একেবারে সাধারণ মানুষ, যাঁরা ধর্মীয় ও অন্যান্য ভণ্ডামীর সবচেয়ে বেশী শিকার হন তাঁদের কাছে পৌঁছতে পারব কি?

এই কথাটা গণ বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যেকোন পত্রিকার সম্বন্ধে যেমন সঠিক, অন্যান্য মানুষ-মুখী যেকোন লেখালিখির ক্ষেত্রেই বোধহয় সমানভাবে প্রযোজ্য। ফর্মগুলো হয়ত আলাদা হবে, কিন্তু আমাদের পৌঁছতে হবে। পৌঁছোনোটা শুধু সংখ্যাতে নয়। পৌঁছোনোটা ভাষাতে হতে হবে, বিষয়বস্তুতে হতে হবে, দামে হতে হবে, আঙ্গিকে হতে হবে। সাধারণ মানুষ এইসব পত্র পত্রিকা যদি নিয়মিত পড়তে পান, যদি এগুলো তাঁদের রোজকার বেঁচে থাকায় সাহায্য করে, তবেই এইসব উদ্যোগগুলোর সবচেয়ে বড় সার্থকতা হবে। তার জন্য বিপণন বা অন্য বিষয়গুলোর কথা, দাম যথা সম্ভব কম রাখার কথা, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাহায্য নেওয়ার কথা, রাস্তার মোড়ে মোড়ে সাইক্লোস্টাইল করে আটকে দেওয়ার কথা, প্রাচীর পত্রিকা করার কথা সব কিছুই কিন্তু ভাবা দরকার।

আমি বৌদ্ধিক চর্চা ও অনুশীলনের দিকটাকে ছোটো করছিনা, কিন্তু সে বিষয়েও আমার কিছু প্রশ্ন আছে। একটি খুবই সমৃদ্ধ, মননশীল এবং এলিট পত্রিকার সম্পাদক আমাকে একবার বলেছিলেন যে কতজন পড়ছেন সেটা বড় কথা নয়, কে পড়ছেন বা কারা পড়ছেন সেটাই বড় কথা। সেইজন্যই পত্রিকার বিক্রিসংখ্যা বা প্রচার নিয়ে ওনাদের খুব একটা মাথাব্যথা নেই। সন্দেহ নেই একথাটি খুবই প্রণিধানযোগ্য এবং আংশিক সত্য। কিন্তু এখানেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। এই 'কে পড়ছেন'-এর 'কে' টা কে ঠিক করবে? সেইসব সংবেদী, অনুভূতিশীল পাঠক-পাঠিকারা, যাঁদের জন্যই আমাদের যাবতীয় লেখালিখি তাঁর কি শুধুই শহুরে, মধ্যবিত্ত, এলিট সমাজে আটকে আছে? তার বাইরে নেই? পেশায় রাজমিস্ত্রি যে মানুষটি গভীর মননের লোকগান বাঁধেন, যে গ্রাম্যবধূটি কাঁথার ওপর আশ্চর্য ছবি আঁকেন, প্রাইভেট ফার্মে সাধারণ চাকরী করা যে ছেলেটি সন্ধ্যেবেলা সারাদিন হাড়ভাঙা খেটে এসেও বিনা পয়সায় ছোটোদের টিউশন পড়ায়, তাদের সাহিত্যবোধ, শিল্পবোধ বা সমাজ চেতনা কি 'ড:' লেখা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের থেকে কোনও অংশে কম? কে বুঝবে আর কে বুঝবেনা তার বিচার করার আমরা কে? এলিট উন্নাসিকতায় নিজেরাই নিজেদের পিঠ চাপড়ালে, অন্যদের এলেবেলে ভাবলে নিজেদের পিঠই ব্যথা হবে, আর কারুর কিছু হবে কি? মনে রাখতে হবে, যত বেশী সচেতন মানুষ, তত সচেতন সমাজ, তত বড় প্রেশার গ্রুপ। সরকার, রাষ্ট্র ততই কর্পোরেট শাসনের চোখ রাঙানিকে অগ্রাহ্য করে, মানুষমুখী নীতির পথে হাঁটতে বাধ্য হবে।

এর বাইরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। সেটা হল একটা

মানুষ শেষ পর্যন্ত কতটা বদলায় এবং আদৌ বদলায় কি? তাহলে লিখে লাভ কি?

হয়ত ভুল বলছি এবং এটা হয়ত অতি সরলীকৃত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নির্যাস, কিন্তু আমার মনে হয় একটা বয়সের পর মানুষের মধ্যে তার আজন্ম লালিত বোধ, বিশ্বাসগুলো একদম শক্ত শেকড়ের মতো বসে যায়। সেটা থেকে তাকে টলাতে গেলে, ভালো কোনো দিকেও টলাতে গেলেও, সামাজিক মানুষের থেকে মুখ ফিরিয়ে ব্যক্তি মানুষের দিকে তাকাতে হবে। তার আচার, আচরণ, সমস্যা ও বিশেষ করে ভয়কে বুঝতে হবে। আমরা বলে দিচ্ছি এটা তোমার পক্ষে ভালো, বললেই কিন্তু সে ভালো মানবে না, তার স্তরে নামা প্রয়োজন। যে মানুষটা জলপড়া খায় সে ছোটোবেলা থেকে এরকম একটা পরিবেশে মানুষ হয়েছে যে সেটাকেই সে স্বাভাবিক ভাবে। শুধুমাত্র ওটা 'অবৈজ্ঞানিক', ওটা 'খেওনা' বললেই সে কি খাওয়া ছাড়বে? একটা মানুষ আসলে সারাজীবন ধরে অনেক দ্বন্দ্বকে টপকাতে টপকাতে পথ হাঁটে। সেই দ্বন্দ্বগুলোর কিন্তু কোনো সহজ সমীকরণ হয় না। এটা ভালো বা ওটা খারাপ হয়না। তার দ্বন্দ্বকে না বুঝলে তার কাছে আমরা পৌঁছতে পারব না।

এই জন্য আমার আজকাল খুব বেশী করে মনে হয় কাজ যা করার তা মানুষের তৈরী হওয়ার স্তরে অর্থাৎ ছোটোদের নিয়ে, কিশোর কিশোরীদের নিয়েই করা দরকার। যাদের মন এখনও দড়কচা মেরে যায়নি, যাদের চোখে হাজারটা স্বপ্ন আর মনে হাজারটা প্রশ্ন। অথচ আশ্চর্য হল এই ক্ষেত্রটিতেই খুব একটা কাজ হয়না। বা বলা যায়, প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম কাজ হয়। সেটার কারণ কি যে এটা অনেক বেশী কঠিন কাজ? ততটা পিঠ চাপড়ানি বা চটজলদি স্বীকৃতি নেই? আমার কিন্তু মনে হয় গোড়া পত্তনটা ঠিক ঠাক হয়ে গেলে সব কাজই অনেক সহজ হয়ে যাবে, বড় হয়ে সরতে সরতে ভাঙতে ভাঙতে গিয়েও পতনের মুখে কোথাও একটা জায়গায় আটকে যাবে।

এতক্ষণ ধরে এতগুলো প্রশ্ন তুললাম মানেই আমি কিন্তু এই বিরাট উদ্যোগকে এতটুকুও ছোটো করতে চাইছিনা, আশা করি সবাই তা বুঝবেন। সিস্টেম অনড়, বদলানো অসম্ভব বলে হাত গুটিয়ে অলস হয়ে বসে থাকার বদলে সিস্টেমকে পাল্টানো, এমনকি ঠেলার চেষ্টাও যে হাজারগুণ মূল্যবান সেটা বলার দরকার পড়েনা। তাতে আর কোনো কাজ হোক আর নাই হোক দুটো কাজতো হয়ই হয়। একটা হল একই ক্ষেত্রে কাজ করা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ভাবনার আদান প্রদান আর দ্বিতীয়টা (যেটা সবচেয়ে বড়) হল ভালো কিছু কাজের সংগে যুক্ত থাকার প্রভূত আনন্দ, যা মানুষকে বেঁচে থাকার উৎসাহ জোগায়, অনুপ্রেরণা জোগায়। ফলে এই কথাগুলো একজন সমালোচক হিসাবে নয়, সাথী হিসাবেই তুললাম।

পথেই হয়নি পথ চেনা

কৌশিক বন্দোপাধ্যায়

kausik56@gmail.com.

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু মানুষ যেন স্মৃতিভূক হয়ে যায়। মনে পড়ে যায় বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার প্রথম দিকের দিনগুলি। গণ-বিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের আহ্বানে এক বৃহৎ মঞ্চের পতাকাতলে অনেকগুলি সংস্থার দীর্ঘ পদযাত্রা মিলেছিলো বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ দপ্তরে। প্রবল বৃষ্টিকে কখনো উপেক্ষা করে—সম্ভবত: '৮২ বা '৮৩ সালে। সেই প্রথম পরিচয়—তারপর পায়ে পায়ে বৌবাজার পাড়ার বিজ্ঞানকর্মী দপ্তরে প্রায় ফি-সপ্তাহে আনাগোনা শুরু। সমবয়সী বেশ কিছু সমমনস্ক তরুণকে দেখেছিলাম—তাদের মধ্যে জনাকয়েক দীর্ঘদিন থেকে গেছেন-প্রায় গোড়া থেকে। এছাড়া ট্রেনযাত্রার মতো-উৎসাহী বন্ধুরা এসেছেন নানা সময়ে।

সে সময়ে সংস্থার কর্মকাণ্ড নানা দিকে বিস্তৃত হচ্ছিলো—একদিকে পরিবেশ রক্ষার যে আন্দোলনগুলি নানা অঞ্চলে গড়ে উঠছিলো সেগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের দিক; অপর দিকে নানা আলোচনাচক্র বিতর্ক সভা ইত্যাদির মাধ্যমে সংস্থার তাত্ত্বিক কর্মকাণ্ড। এসবই কম-বেশি চোখের সামনে দেখেছি বা অংশ নিয়েছি। সংস্থার মুখপত্র "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী" পত্রিকাতেও সেসবের অনেক নথি মিলবে।

প্রস্তুতিপর্ব

যতদূর জানি ১৯২৭ সালে গঠিত British Association of Scientific Workers (BASW) নামক সংস্থার অনুপ্রেরণায় তৈরী Association of Scientific owrkers of India-এর অনুসরণে Scientific workers Forum, W.B. তথা "পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা"টি গঠিত হয়েছিলো। বিজ্ঞান-গবেষণাগারে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও অধ্যাপনায় যুক্ত মানুষদের একটি মঞ্চ হিসাবে এটি আত্মপ্রকাশ করে প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের কার্যকালে। সূচনাপর্বে বিনায়ক দত্তরায়, হিরন্ময় সাহা প্রমুখের মত কিছু প্রথিতযশা বিজ্ঞানীরা সক্রিয় ভূমিকায় থাকলেও পরবর্তী পরিস্থিতিতে তাঁরা যেন খানিকটা দূরে সরে গেছেন। এই ঘটনার কারণ নির্ণয় করা আমার পক্ষে কঠিন; তবে আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বুদ্ধিজীবী তথা বিজ্ঞানীদের একাংশের মধ্যে তৎকালীন সরকারের নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সমর্থনের সূত্রে এক ধরনের অবস্থানগত নৈকট্য দেখা দেয়। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা তাতে শামিল হতে পারেনি। এদিকে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা থেকেও সংস্থা সরে আসে।

পরিবেশ আন্দোলন

এরই পাশাপাশি হুগলী জেলার কুন্তীঘাটে কেশোরাম রেয়নের কারখানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারে প্রস্তাবিত রাসায়নিক সার কারখানা—এগুলির পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠলে আমাদের সংস্থা বেশ সক্রিয়ভাবে এগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরে ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটলে, কুখ্যাত ইউনিয়ন কার্বাইড ও তৎকালীন সরকারী নীতির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং এসবের সূত্রে বেশ কিছু নতুন সদস্য এসে যোগ দেন। এ ধরণের উন্নয়ন-বির্তক গুলিকে উপলক্ষ্য করেই হয়তো সদস্যদের মধ্যে সাইন্সটিস্টদের তুলনায় আর্টিস্টদের আধিক্য সভাগুলিতে চোখে পড়তে থাকে—তার প্রভাব দেখা যাবে সুদূরপ্রসারী, তবে তা ভালো কি মন্দ তার জবাব ভাবীকালই দিতে পারে।

কাছে ছিলে দূরে গেলে

বাস্তবে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে একদল নতুন মুখ যেমন, কাছে চলে এলেন—যাঁদের অন্যতম বিশুদ্ধতার (প্রয়াত বিশুদ্ধনন্দ পুকাইত) মতো সদস্যদের, এর বিপরীত নতুন ধারা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অপর কিছু সদস্যরা

খানিকটা হয়তো দূরে সরে গেলেন। বিশুদ্ধদার প্রসঙ্গে পরে আসছি; কিন্তু একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো—এই দূরে সরে যাওয়া কি অনিবার্য ছিলো? এই প্রশ্নটি দীর্ঘদিন ধরে আমাকে ভাবিয়েছে! মতাদর্শগত বিরোধ অল্প বিস্তর থাকতে পারে কিন্তু তা কি এমন গভীর যে একেবারে জল-অচল হয়ে যাবার মতো বিচ্ছেদ ঘটে যেতে পারে? এতো দিন পরে সন্দেহ হয়—ব্যক্তিত্বের সংঘাতই এক্ষেত্রে নির্ণয়ক ভূমিকা নিয়েছিলো। তিনি বা তাঁরা আমাদের সবার মতো প্রিয়জনই হোন আর তাঁর যতো অবদানই থাকুক না কেন—তেমন এক—দুজন সদস্যের পছন্দ অপছন্দটাই যদি গরিষ্ঠাংশের মতামতের ওপরে প্রাধান্য পায় তাহলে সংস্থায় নতুন কোনো প্রস্তাব গ্রহণ বা পথ নির্দেশ দুষ্কর হয়ে দাঁড়াতে পারে। অস্বীকার করা শক্ত যে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একটা কালপর্বে আমরা এভাবে এক ধরনের গুরুবাদকে খানিকটা প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছি—যে জিনিসটা যুক্তিবাদী মানসিকতার সঙ্গে তেমন মানানসই নয় বলেই আমার মনে হয়।

দেখেছি একটি মুখ মুখর মিছিলে

অথচ পাশাপাশি অন্য দৃষ্টান্ত অনেক সহযাত্রীদের মধ্যেই ছিলো— যেমন, মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, অভিজিৎ লাহিড়ি, অমূল্য মণ্ডল, কুমারেশদা আরও কতোজন—এঁরা যেমন সুধী মণ্ডলীর সভায়, তেমনই আমাদের মতো বালখিল্যদের সান্নিধ্যে সর্বত্রই সমান স্বচ্ছন্দ সপ্রতিভ ছিলেন। এই বিরল গুণাবলী কিন্তু আমরা অনেকে আয়ত্ত করতে পারলাম না, হয়তো সেভাবে চেষ্টাও করলাম না।

সমবয়সী সদস্যরা দল বেঁধে নানা জায়গায় সভা-সমিতিতে গেছি—অনাবিল আনন্দ পেয়েছি। এর মধ্যে বর্ণাঢ্য চরিত্র ছিলো সত্যব্রত কর—নানা কূট প্রশ্ন ও তাত্ত্বিক বিতর্কে সে ছিলো সর্বাগ্রে। সদাহাস্যময় সত্য আজ আর নেই; কিন্তু তার সঙ্গে মতান্তর কখনোই মনান্তর বা তিক্ততার দিকে যেতো না। বিশুদ্ধদার কথা হচ্ছিলো একটু আগে।

ধূসর স্মৃতির আড়ালে উজ্জ্বল

বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইতকে দেখতাম প্রায় নিয়মিত বিজ্ঞানকর্মীর সাপ্তাহিক সান্ধ্য আসরে এবং আমাদের নানা সভা-সমাবেশে আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে। একান্ত আটপৌরে পোশাক ও বাচনভঙ্গীতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য কলকাতার তথাকথিত নাগরিক পরিশীলিত পরিমণ্ডলের বিপরীত কোটির বলা চলে। মন্দির বাজারে দূষণকারী সার কারখানাটি তাঁদের মতো মানুষের নেতৃত্বে 'মন্দিরবাজার দূষণ প্রতিরোধ কমিটি'-র সফল আন্দোলনের ফলে উৎপাদন শুরু করতে ব্যর্থ হয়। এই কপটতার যুগে, নাগরিক বৈভব ও উচ্চনাদের যুগে তাঁর মতো শুদ্ধ ও প্রচারবিমুখ একনিষ্ঠ কর্মী বিরল।

ঐ সময়ে বি.বা.দী. বাগের কর্মস্থল থেকে বেরিয়ে সাপ্তাহিক আসরে আসার সূত্রে কিছুদন পরে মহাকরণে কর্মরত আরো কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে আলাপ হয়। তার মধ্যে একজন সুনীলভূষণ গুহ- বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে সখ্যতা ও অভিভাবকত্ব দুই বজায় ছিলো। তাঁর প্রিয় ছিলো গণিত ও কবিতা।

ধুতি ও সাদা শার্ট পরনে আমাদের মতো তরুণদের মাঝে তাঁকে দেখা যেতো প্রায়ই—বিশেষত: আলোচনাচক্র ও সাংগঠনিক সভাগুলিতে। গণিতের লোক হওয়ার ফলে হয়তো তাঁর আলাপচারিতা বা বক্তৃতা ছিলো সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। বিরলকেশ এই প্রবীন বিদ্যোৎসাহী মানুষটি শ্রোতার ভূমিকাই পছন্দ করতেন বেশি। এঁদের দুজনের কেউ আর জীবিত নেই—নেই সেই একান্নবর্তী পরিবারের মতো পরিমণ্ডল। ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়—বিষয়গত ও বিষয়ীগত এই উভয় কারণই কিছুটা দায়ী বর্তমান পরিস্থিতির জন্য। তবে এই পত্রিকা বা সংস্থার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যাচ্ছে—এমনটা বলাটা ঠিক হবে না। মননশীল পাঠক, সচেতন মানুষ—তখনো ছিলো সংখ্যায় কম, এখনো তাই। প্রযুক্তি বিপ্লব বা গণমাধ্যমের সংযোগ সাফল্যের সেভাবে সদ্ব্যবহারের দিকে আমরা এখনো পা দিই নি—তার জন্য দোষ প্রযুক্তির হয়তো পুরোটা নয়। অথচ প্রবল প্রতিপক্ষ এই নবলব্ধ অস্ত্রে আমাদের কাবু করে ফেলেছে বলা যায়।

বর্তমান কঠিন সময়েও যাঁরা আমাদের প্রিয় এই সংস্থার চাকাকে সচল রেখেছেন, বি-ওবি-র প্রতিটি সাপ্তাহিক বৈঠককে ভরিয়ে রেখেছেন—সেই সব সদস্যবন্ধুদের সাধুবাদ জানাই। কিন্তু সংস্থার যে অন্বিষ্ট, যেখানে পৌঁছোনোর কথা ছিলো—যে কোনো কারণেই হোক সেখান থেকে আমরা যে পিছিয়ে পড়েছি এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। সম্প্রতি অন্য

অনেক সংস্থার মতো আমাদের সংস্থারও ভাটার টান যেন দেখা যাচ্ছে। অথচ এমনটা যে অনিবার্য—এ কথা বোধহয় জোর দিয়ে বলা ঠিক নয়।

প্রযুক্তি বিপ্লব

তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তারের প্রেক্ষিতে কিছু ব্যক্তির উদ্ভাবনী ক্ষমতায় ভর করে নানারকম প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবসায়িক সংস্থার অবিশ্বাস্য উত্থান ঘটে চলেছে। এ থেকে বোঝা যায় নতুন পরিস্থিতি যেমন আমাদের বেশ কিছু অভাবিত সমস্যার সম্মুখীন করেছে, পাশাপাশি কিছু নতুন ধরনের সুযোগও এনে দিয়েছে—আমাদের সংস্থার পক্ষে তার সদ্ব্যবহার কতোটা সম্ভব সেটা অবশ্য আলোচনা সাপেক্ষ।

আরেকটি ব্যাপার হলো—জরুরী অবস্থার অবসানে যেমন ১৯৭৭ সাল নাগাদ প্রায় দমবন্ধ অবস্থার শেষে দেশে প্রচুর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংস্থার জন্ম হয় এক ধরনের প্রাণচঞ্চল্যের তাগিদে। বর্তমানেও কিন্তু এই প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায়না—কারণ একদিকে যেমন বিজ্ঞান-পেশায় নিযুক্ত ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-বিজ্ঞানী-বিজ্ঞান অধ্যাপক সবার জন্যই একটি সংগঠিত মঞ্চের অভাব অনুভূত হচ্ছে; পাশাপাশি নানা ধরনের সংকট ঘনীভূত হচ্ছে, যার নিরসনে এই বিজ্ঞানসাধকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রয়োজন— যেমন, জলবায়ু পরিবর্তন, বাস্তুতন্ত্রের বিপর্যয়, সর্বোপরি দিশাহীন অপরিণামদর্শী (তথাকথিত) উন্নয়নের অভিঘাতে শৈলশহরগুলিসহ বহু ভূখণ্ডে প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

এসো মুক্ত করো

এর সব কিছু থেকেই পরিত্রাণের জন্য মানুষের প্রবল প্রত্যাশা রয়েছে বিজ্ঞানী ও ব্যাপক অর্থে বিজ্ঞানকর্মীদের কাছে। একাজের জন্য গভীর অভিনিবেশ ও গবেষণার প্রয়োজন। শুধুমাত্র চটকদার কিছু শ্লোগান ও পোষ্টার ফেস্টুন এঁকে পরিবেশ-দিবস উদ্‌যাপন করে যাবতীয় দায় সারলে মোটেই চলবে না। তাছাড়া আমাদেরে সমস্যার সমাধান প্রধানত: আমাদেরই করতে হবে; তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সমস্যা পারতপক্ষে শিল্পোন্নত দেশগুলি সমাধান করতে যাবে না এবং যদি বা করে, তা করবে নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থে বিপুল মুনাফার তাগিদে। সুতরাং এ ধরনের দেশীয় পরিবেশগত সমস্যা—যার বিশ্বজনীন তাৎপর্য রয়েছে, তার সমাধান কল্পে প্রয়াস আশু কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

অনেকে পাঠক বলতে পারেন আমাদের মত সীমিত সামর্থ্যে এতবড়ো কাজ করা অসম্ভব। তাছাড়া এসব দেখার জন্য রাজ্যে ও কেন্দ্রে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, নানান আমলা সক্রিয় রয়েছে। এই দুটি বক্তব্যের কোনোটিই ভুল নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ধরনের প্রচেষ্টার যে কোনো প্রয়োজন নেই, এমন কথা মোটেই বলা যায় না—কারণ সমস্যাটির চরিত্র এতোই জটিল ও ব্যাপক যে সমগ্র উন্নয়নের 'মডেল'-এর বিষয়টি এর সঙ্গে জড়িত। এ ধরনের সমস্যার সাধারণত কোনো চটজলদি সহজ সমাধান সম্ভব নয়—বহু বিষয়ের বহুজনের বিবেচনা ও বিচারশক্তির সদ্ব্যবহারের দাবি রাখে। আরেকটি বড়ো কথা হলো সমস্যাটিকে ঠিকমতো চিহ্নিত করা, প্রশ্ন করা, একটা স্বাস্থ্যকর বিতর্কের সূত্রপাত করাটাও একটা প্রয়োজনীয় কাজ। আমাদের সংস্থা যদি সেদিকে কোন পদক্ষেপ করতে পারে—এখনও তাহ'লে মনে হয় একটা কাজের কাজ হয়।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা এবং 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকা, মনে হয়, পথ হেঁটেছে সেই লক্ষ্যে, কবি যাকে ভাষা দিয়েছিলেন—'তুমি মাটির দিকে তাকাও, মাটি প্রতীক্ষা করছে। তুমি মানুষের হাত ধরো, সে কিছু বলতে চায়'-বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কিছু স্মৃতি কিছু কথা

অমিত চৌধুরী
(amit.chaudhuri@kolkatacdac.in)

পশ্চিমবঙ্গে সত্তরের দশকের শেষ থেকে যার শুরু—সেই গণবিজ্ঞান আন্দোলন, ছোট্ট ছোট্ট স্রোতধারার সম্মেলনে এক—সামাজিক সাংস্কৃতিক তথা বৌদ্ধিক আলোড়নের প্রবাহ! প্রায়, চল্লিশ বছরের যাত্রাপথে বৈচিত্র্যে, অভিনবত্বে বা তাৎপর্যে এই "গণবিজ্ঞান"—বিষয়ক "সমবেত-চর্চা" কিন্তু ছোট বা গুরুত্বহীন আদৌ নয়। এই চর্চার কিছু কথা ও কিছু স্মৃতি নিয়ে এই লেখা! ফিরে দেখতে গিয়ে এখানে, "চিরতরে" হারানো কয়েকজন প্রিয় তথা শ্রদ্ধেয় মানুষকে স্মরণ করবো গণবিজ্ঞানেরই প্রাসঙ্গিকতায়—যাঁদের কাছ থেকে দেখেছি।

সম্প্রতি চলে গেলেন সত্তর পেরোনো মণিদা ও পঞ্চাশ পেরোনো স্বপন দা। দুজনে-দুরকম মানুষ ছিলেন—বহিরঙ্গে বা প্রকাশ ভঙ্গীতে। অন্তরঙ্গে তাঁরা একই জাতের "বড়" মানুষ! এরকম-ই "বড়" মানুষ ছিলেন—সত্যব্রত কর বা রণজিৎ ঘোষ। যাঁদের আমরা হারিয়েছি—দুরকম জটিল অসুখে—একেবারে অসময়ে! গণবিজ্ঞানের স্রোতধারায় তাঁদের প্রাণশক্তির প্রকাশ ঘটেছে এক একটা পর্বে, নিজস্ব চরিত্র বা বৈশিষ্ট্যে! বাঙালি বা ভারতীয় সমাজের বিগত বছরগুলির মূল্যবোধের ক্ষয় মানবিক চেতনার পশ্চাদপসরণ এবং "ক্ষমতা তথা অর্থের আস্ফালনের পটভূমিতে—এই চারজন ব্যতিক্রমী মানুষ দেখিয়ে গেলেন "এভাবেও বাঁচা যায়"। এছাড়া এখানে পঞ্চম যে ব্যক্তির কথা বলবো তিনি অশোক-দা, উৎস-মানুষ ভিত্তিক কর্ম তথা চিন্তা-প্রবাহ সৃষ্টির প্রধান পুরুষ। গণবিজ্ঞানের ধারা সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু "বড়" মাপের একজন মানুষ নয়, ছিলেন "গণবিজ্ঞান" নিয়ে সামাজিক-ভাবে পথ দেখানো পরিচালক গোত্রের মানুষ। এই বড় মানুষদের শ্রদ্ধা জানাই—আরো একবার, "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী"—নামক—চল্লিশবছরের গণবিজ্ঞান চেতনার মুদ্রিত প্রকাশ-প্রবাহে।

রণজিৎ দা, বা ড: রণজিত ঘোষ যখন এম বি বি-এস পাস করে—ইনটার্ন-হাউসস্টাফ,—তখনই তাঁকে বন্ধু তথা দাদা হিসেবে পেয়েছিলাম—গণবিজ্ঞান বা গণস্বাস্থ্য আন্দোলনের সূচনাপর্বে। কখনও উত্তরপাড়ার "শ্রমজীবী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে", কখনও শিয়ালদার ডা: কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটির অফিসে আবার কখনও আমাদের তৈরী ছোট গণবিজ্ঞান সংস্থা Peoples Science Association-এর উদ্যোগে বেলেঘাটার "খাল-ধার" বা আন্দুলের আসে-পাশের গ্রামে গণবিজ্ঞান প্রচারে-রণজিতদার সঙ্গে মেলামেশা ও কাজকর্ম করেছি আশির দশকের শুরু থেকে। যাদবপুরের প্রযুক্তি-পাঠ, আর জি করের চিকিৎসা-বিজ্ঞান-শিক্ষা। সব মিলিয়ে-মিশিয়ে একই সুরে, একই চেতনায়-আমরা অভাব অনটন অব্যবস্থার সমাজের অবিজ্ঞান অশিক্ষা অন্ধবিশ্বাসের জাঁতাকলে পিষ্ট মানুষের কাছে কিছু প্রয়োজনীয় পরিষেবা বা কিছু শিক্ষামূলক প্রচার নিয়ে যে "কাজ" করতাম, তার নাম "গণবিজ্ঞান" বা "গণস্বাস্থ্য"—এটা ভেবে ও বুঝে বেশ গর্ব হতো! শেষ লোকাল ট্রেনের-কামরায় আন্দুল যেতে যেতে—রণজিত-দার স্নেহশীল প্রাণবন্ত ও আত্মবিশ্বাসী কথা-বার্তা শুনতে শুনতে ওকে আমার ডা: কোটনিস বা ডা: নরম্যান বেথুনের উত্তরাধিকারী মনে হতো। রণজিৎদার মৃত্যু হলো আশির দশকেরই দ্বিতীয় ভাগে এক ভয়ঙ্কর রক্তের রোগে। রণজিত-দাকে সুস্থ করে তোলার জন্য—"কলকাতা-লন্ডনের" চিকিৎসা-সহায়তাকে কেন্দ্র করে 'অর্থ সংগ্রহের' সূত্রে এক জন-উদ্যোগ গড়ে উঠেছিলো। এই জন-উদ্যোগের পরিচালকেরা—রণজিতদার স্মৃতি গণস্বাস্থ্যেরই কাজে রক্ষা করে চলেছেন—আন্দুলের রণজিত স্মৃতি হাসপাতালে।

রণজিতদার মতো মানুষেরা "গণবিজ্ঞানের" স্বপ্নে,

চেতনায় বা কাজে আমাকে আরো অনুপ্রাণিত করেছিলো—আর আমি তাতে জড়িয়ে নিয়েছিলাম সত্যকে। যাদবপুরের সান্ধ্য ছাত্রদের এক আন্দোলনে, আমাদের "চিন্তা-মত-পথ" নিয়ে "আড্ডা-আলোচনা"র আঁতুড়-ঘর সত্যেনদার ক্যান্টিনে। "তৃতীয়" ধারার রাজনীতির কচকচি-তে কিছুটা "বিভ্রান্ত" ও "বিরক্ত"—সত্যব্রত করকে মানবিক ও সামাজিক সত্তাকে ধরে রাখার, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছিলো—গণবিজ্ঞান গণস্বাস্থ্যের কাজ। আমার কালীঘাট রাসবিহারী অঞ্চলের পরিচিত ঘর বাড়ী, পাড়ার ঠেক, কচি-কাঁচাদের নিয়ে কিছুটা সামাজিক উদ্যোগ এসবের মধ্যে সে যেমন পেয়েছিলো কিছু অন্যরকম প্রাণের স্পর্শ—সায়েন্স কলেজের রবীনদাদের সঙ্গে মিশতে মিশতে—সে নিজে হয়ে উঠলো "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী"র কাজকর্মের এক প্রাণশক্তি! গণবিজ্ঞানকে—গণ রাজানীতির তথাকথিত "বিপ্লবী" বা "বাম পন্থী" ধারার অধীনে—এক "নিয়ন্ত্রিত", "নির্দেশিত" কর্মধারা হিসেবে চলতে হবে এটা সে মানতো না। ডা: অমিতাকে বিয়ে করে এক নতুন জীবনে প্রবেশের পর ওর সঙ্গে আমার সংযোগটা কমে গেলেও একেবারে ছিন্ন হয়নি— ওর অকাল মৃত্যুর আগে অব্দি। সত্যিকারের মানবিক মূল্যবোধ, অক্লান্ত জিজ্ঞাসা ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট "আধুনিক-সমাজ"— নিয়ে নতুন নতুন মানবিক উদ্যোগ-কে সাথী করে সত্য বেঁচে ছিলো সত্যিকারের মানুষের মতো। ওর স্মৃতিকে ধরে রাখতে-একটি সুন্দর বই প্রকাশিত হয়েছে। "আরো কিছু" হওয়া উচিত।

কালিঘাট থেকে জীবনের মাঝ বেলায় কালিন্দীতে থিতু হতে গিয়ে স্বপনদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলাম নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে। দমদম জপুরের অলিগলি থেকে—একটু ছিমছাম কালিন্দীর হাউসিঙে—একটু আধটু সামাজিক সাংস্কৃতিক কাজকর্মের উদ্যোগ সৃষ্টি করতে করতে—স্বপন-দা ও তার পরিবারকে পাশে পেয়েছিলাম। আনন্দের কথা এই যে—আমাদের মশা-চেতনার আসর, আকাশ পর্যবেক্ষণের কিশোর জমায়েত-সবকিছুতেই ছিলো গণবিজ্ঞান, গণস্বাস্থ্যেরই দৃষ্টিভঙ্গী! ন্যাশনাল মেডিকেল থেকে পড়াশোনা করে, "প্রিভেন্টিভ ও সোশ্যাল মেডিসিন"-এ আরো "শিক্ষা ও গবেষণা" করা স্বপনদা, "ই-এস-আই"-এর সরকারী অফিসার হলেও ছিলো একেবারে "মাটির মানুষ"! পাশের পাড়ার রবীন মজুমদার যেহেতু "বি-ও-বি"র এক প্রধান ব্যক্তি—স্বপনদা অনেকটাই জড়িয়েছিল "বি-ও-বি"-র সঙ্গে —একেবারে শেষদিন পর্যন্ত। আসলে, স্বপনদা, সত্য ও আরো অনেকের "বি-ও-বি"-ঘনিষ্ঠ তা-র একটা বড় কারণ—"বি ও বি"-র পাল্টে পাল্টে যাওয়া-সঙ্গী-সাথীর দলের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য! সে হলো, উচ্চ-স্তরের, খোলা-মনের জ্ঞান ভিত্তিক, ভাবনা-চিন্তা-চর্চা করেও মানবিক মূল্যবোধে স্থির থেকে মাটির কাছাকাছি থাকতে পারা, কোনো "প্রচার-মূলক" বা "নেতা-সুলভ" ভাব-ভঙ্গী না ধরে রেখে! রক্তের জটিল অসুখে অনেক লড়াই করে চলে গেলো—একজন "ছোট" আন্দোলনের "বড়" মানুষ—ডা: স্বপন দাস!

গণবিজআন আন্দোলনে যে বৈশিষ্ট্য—"বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী"-কে এক স্বতন্ত্র চরিত্র দিয়েছে বলে মনে করি, —তা হলো "মিলে-মিশে" চলার প্রচেষ্টা থেকে শুরু করে ব্যক্তি মানুষকে বা ভিন্ন-মতের কোনো "সমষ্টি-গত" প্রকাশ-কেও—মানবিক মূল্যবোধে ভর করে শ্রদ্ধা সম্মান জানানো। আশির দশকের শুরুতে "হিরোসিমা দিবস" কে কেন্দ্র করে ও পরে "ভূপাল-দুর্ঘটনা" নিয়ে—যে ধরণের মিছিল সভা প্রচার প্রতিবাদ গড়ে উঠেছিলো—তা "বি-ও-বি"-র এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করেছে। আবার, এই বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেলাম মণিদার স্মৃতি সভায়। সায়েন্স কলেজে, বিজ্ঞান-ইতিহাসের ছায়া ঘেরা পরিবেশে—এক দুপুরে আবার এক লেকচার হলে—প্রায় উপচে পড়া ভীড়! সবাই এসেছেন—মণিদাকে— সদ্য প্রয়াত অধ্যাপক মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদারকে স্মরণ করতে, অথচ হলো যেন, গণ বিজ্ঞানের এক পুনর্মিলন সভা! "বি-ও-বি"-র পাতা যাঁরা কয়েক দশক ধরে ওল্টাচ্ছেন, তাঁরা জানেন—পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতে—গণবিজ্ঞান ভাবনা-কে তীব্র আবেগ আন্তরিকতা ও স্পষ্ট অথচ গভীর উচ্চারণে—বিশ্লেষণে যাঁরা প্রাণসঞ্চার করেছেন তাঁদের অন্যতম শ্রদ্ধেয় মণিদা। মণিদা নিজেকে মূলত: "বি-ও-বি"-র একজন মনে করতেন এটা যেমন সত্য, আবার তাঁর "লেখা উৎসাহ উদ্যম"—প্রায় চল্লিশ বছর ধরে-পত্র-পত্রিকা,

বিজ্ঞান-ক্লাব, গণবিজ্ঞান সংগঠন, গণস্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠান ও তাদের সঙ্গে যুক্ত সর্বস্তরের মানুষকে যেভাবে ভরসা যুগিয়েছে বা প্রেরণা দিয়েছে—তা বোঝা গেছে—কাছে দূরের মানুষদের কথায় (প্রসঙ্গ:, সায়েন্স কলেজের স্মৃতি-সভা)। গণস্বাস্থ্যের "অঘোষিত" "অ-রাজনৈতিক" "অ-বামপন্থী" এক কর্মী—সুচিকিৎসক, আমার বাবার মৃত্যুর পরে (১০ বছর আগে)—একটু উদ্যোগ নিয়েছলাম—তাঁর গণমুখী চিকিৎসা ভাবনাকে স্মরণ করে—কিছু করার। এরকম—এক ছোট্ট সভায় কালীঘাটে ছুটে এসেছিলেন মণিদা। কল্যাণী থেকে। সঙ্গে ছিলো সদ্য প্রকাশিত আর্সেনিক বিষয়ক তাঁর বইয়ের কয়েককপি ! শিক্ষা মূলক আড্ডা গল্পে সেদিন সভার সবাই যেন মেতে উঠেছিল তাঁর উপস্থিতিতে। রোগ অসুখের উৎস বা তার সামাজিক কারণ নিয়ে সচেতন-চল্লিশ বছর ধরে, কম খরচে সুচিকিৎসা প্রদানে পেশাগতভাবে কর্মরত ডা: শঙ্কর চৌধুরীর "স্মৃতি" এবং মণিদার প্রাণশক্তি ও "সত্তা"—রসায়নের জ্ঞান-চর্চা, অধ্যাপনা, বিজ্ঞানকে মানুষের কাজে লাগানোর জন্য পথে নামা, পেশাগত জীবন-সব যেন--- সেদিন মিলেমিশে গিয়েছিল--- গণস্বাস্থ্যের "ভবিষ্যত" চর্চার আসরে। হ্যাঁ—এই ভবিষ্যত মুখীনতা, অর্জিত জ্ঞান-কে সমাজ সভ্যতায় এগিয়ে চলার সঙ্গে মেলাতে পারার জন্যই মণিদা ও "বি-ও-বি"-র অন্য অনেকে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র! মণিদা ও তাঁর কর্মধারা বা চিন্তাধারাকে গণবিজ্ঞানের একুশ শতকীয় পরিপ্রেক্ষিতে ধরে রাখতে, প্রফুল্লচন্দ্র-চর্চা বা পরিবেশ-ভাবনার প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে—রবীনদাও (রবীন মজুমদার) যথেষ্ট সজাগ ও সক্রিয়। আশা করি, সকলের সহযোগিতায়—শীঘ্রই "মণি মজুমদার"-কে মনে রেখে বড় কিছু উদ্যোগ গড়ে উঠবে।

সাম্প্রতিক গণবিজ্ঞান আন্দোলনে—আশোকদার ভূমিকা পথ প্রদর্শকের! পদার্থবিদ্যার ডক্টরেট অশোকদা—ভেতর থেকে বুঝেছিলেন—বিজ্ঞান-চিন্তার সামাজিক ও আধুনিক অনুশীলন ছড়িয়ে দিতে---"লিটল ম্যাগাজিন" আন্দোলনে—এক বিশেষ ধারা সৃষ্টি করা যায়। এই সুতীব্র অনুভবের বাস্তব রূপ —"উৎস মানুষ" নামক ছোট পত্রিকা, যা আসলে —একটি "আন্দোলন"। সত্তরের শেষে সামজ চেতনার সৃষ্টিশীলতার নতুনতর অনুশীলনের পর্বে "মাটির কাছে" পত্রিকার বিজ্ঞান লেখা সম্পাদনা করতে করতে যে "যাত্রা শুরুতে" তাঁর কাছে এসেছি, সে সংযোগ—সল্টলেকে তাঁর বাড়ী থেকে শেষ যাত্রায় শেষ হলো এটা বলতে পারিনা! উৎসমানুষ আজও বেঁচে আছে। বেঁচে আছে এরকম আরো কিছু উদ্যোগে—যাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন অশোকদা। স্টুডেন্টস হলে—অশোকদার স্মরণসভা ও গণবিজ্ঞানের বৈচিত্র্যময়, প্রাণবন্ত, আবেগস্নাত এক সভায় রূপান্তরিত হয়ে ঘোষণা করেছিলো—এক সত্য- "বিজ্ঞান-চিন্তার পক্ষে ছোট ছোট আন্দোলনকে চোখের মণির মতো" আগলে রাখতে হবে। "রেখা টেনে ছোট-র গতি, বড় যে জল গাবিয়ে চলে"! মিডিয়ার বাড়-বাড়ন্তর যুগে—"বড্ড ঘোলা" চারপাশ! গাবিয়ে চলছে কৃত্রিম বা ফাঁপানো "রুই-কাতলা"! 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-কর্মী"-র পাতায় ধরা থাকুক—স্বপ্ন ও সম্ভাবনার স্বচ্ছ জলের স্রোত রেখাগুলি! বেঁচে থাকুক, স্মৃতি ও স্বপ্নে এবং গণবিজ্ঞানের নবতর কর্মে-প্রিয় মণিদা, অশোকদা, স্বপনদা, রণজিতদা ও সত্য-র মতো বড় মানুষেরা।

স্মরণ

স্বপনদা ও মণিদা

শান্তনু চক্রবর্তী
(s.chakraverti@gmail.com)

এ বছর (২০১৫) স্বপনদা মণিদা দু'জনেই চলে গেলেন। স্বপনদা আগে, মণিদা তার কয়েকমাস পর।

স্বপনদা

স্বপনদাকে চিনতাম দিশার একজন হিসেবে। দিশার অফিসে, বা কখনও অন্যত্র, বছরে দুয়েকবার দেখা হত। একবার একসঙ্গে পিকনিকে গেছি, ডায়মন্ড হারবারে। স্বপনদা সপরিবারে গিয়েছিলেন। সেবার এবং আরও দুয়েকবার লম্বা আড্ডা হয়েছে। তবে তার বাইরে স্বপনদার সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগ থাকেনি (শশাঙ্কদা বলেন পিকনিকে যেতাম না, তাই যোগাযোগ থাকেনি; স্বপনদা আরও গেছেন)। যাই হোক, পরিচয় যেহেতু বহু বছরের তাই যোগাযোগের হার কম হলেও মোট মোলাকাত খুব কম হয়নি।

তাঁর অসুস্থতার পর একবার ফোনে লম্বা কথা হয়েছে। দেখা করতে যাওয়া হয়নি একবারও।

স্বপনদা যে বয়সে চলে গেলেন, সচ্ছল সমাজে আজকাল সেই বয়সে মৃত্যু ব্যতিক্রম। সাধারণত দুর্ঘটনা বা মারাত্মক ব্যাধিতেই এই বয়সি মানুষের মৃত্যু হয়। স্বপনদা মারাত্মক এক ব্যাধিরই শিকার হলেন।

যেমন দেখেছি

স্বপনদা মনোযোগ দাবি করতেন না, মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। সাধারণভাবে স্বল্পবাক, মৃদুভাষী এই মানুষটিকে অনেকক্ষণ ধরে আড্ডা দিতে, কৌতুকে মজা পেতে ও প্রাণখুলে হাসতে দেখেছি। অনেক ব্যাপারে অনেক কিছু জানতেন, খবর রাখতেন, কিন্তু সেসবের উল্লেখ করতেন প্রাসঙ্গিকভাবে; জ্ঞান জাহির করার প্রবণতা চোখে পড়েনি।

আর একটা ব্যাপার নজরে পড়েছে, জানিনা অন্যের সঙ্গে মিলবে কিনা। ডাক্তার বলে জানতাম। কারুর রোগব্যাধি নিয়ে কোনো আলোচনা হলে অভিনিবেশ সহকারে শুনতেন, কদাচিৎ প্রশ্ন করতেন। কিন্তু মন্তব্য বিশেষ করতেন না। ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং মনে হত, কারণ পেশাদারি পরিপ্রেক্ষিতের বাইরে, আড্ডাতে বসেও, ডাক্তারদের দেখেছি রোগ সম্পর্কে সহজে মন্তব্য করতে। হয়তো স্বপনদা রোগব্যাধি নিয়ে ক্যাজুয়াল মন্তব্য করতে চাইতেন না। কিংবা এক্ষেত্রে, স্বপনদার সঙ্গে যোগাযোগের মাত্রা কম হওয়ার দরুণ, যা লক্ষ্য করেছি তা নেহাতই আপতিক, চারিত্রিক নয়।

কিন্তু অন্য একটি ব্যাপারে সাগ্রহে কথা বলতে দেখেছি। কম্পিউটার হার্ডওয়ার বা সফ্‌টওয়্যারের ব্যাপারে। ভাসা ভাসা মনে আছে। তবে এটা মনে আছে, বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম স্বপনদার জানাবোঝার গভীরতা দেখে। আমরা প্রায় সকলেই কমবেশি কম্পিউটার ব্যবহারকারী, সাধারণ ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয় জ্ঞান কমবেশি আমাদের প্রায় সকলেরই আছে। কিন্তু যে-কোনো যন্ত্রের ক্ষেত্রেই, ব্যবহারের মাত্রা ও দক্ষতার তারতম্য হতে পারে। আর আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক যন্ত্রের ক্ষেত্রে, বিশেষত আধুনিক কম্পিউটারের ক্ষেত্রে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য মাত্রায় চলে গেছে। আজকে একটা গড়পড়তা পার্সোনাল কম্পিউটার নিয়ে একজন ওস্তাদ যা করতে পারেন তা দুই দশক আগেও বিশুদ্ধ কল্পবিজ্ঞানের আওতায় ছিল। আপনার দৌড়ের সীমা শুধু আপনার নানাবিধ সফ্‌টওয়্যারের জ্ঞনের দ্বারা সীমিত। আর এর সঙ্গে প্রোগ্রাম করার ভাষা বা 'কোডিং' জানলে তো কথাই নেই। তাই সাধারণের চেয়ে বেশি জ্ঞান বা দক্ষতাসম্পন্ন কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে বলা হয় উন্নত ব্যবহারকারী (অ্যাড্‌ভান্‌সড ইউজার)। স্বপনদাকে নির্দ্বিধায় বলা যেত উন্নত ব্যবহারকারী। আর এই জাতীয় ব্যবহারকারীর জ্ঞন অনেকসময় তথাকথিত কম্পিউটার পেশাদারদের চমকে দিতে পারে। (আধুনিক তথ্যনির্ভর যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে এটা হামেশাই হয়, বিশেষত নেট্‌-এ পাঠ নেওয়ার সুযোগ দারুণভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে। আসলে, যে প্রযুক্তি নতুন, বা যে প্রযুক্তি দ্রুত পালটায়, সেখানে যথার্থ জ্ঞান-যোগ্যতার সঙ্গে ফর্মাল শিক্ষাগত মানের সম্পর্ক কম থাকে। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এটা বড়ো বেশি সত্যি।)

স্মরণসভায় আরও জানতে পারি যে স্বপনদার কম্পিউটার পারদর্শিতা তাঁর নানাবিধ কারিগরি-বিষয়ক অনায়াসপটুত্বের অংশ। এটা লিখতে গিয়ে আমার অগ্রজ বন্ধু অমিতরঞ্জন রায়ের কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই দেখেছিলাম। যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও টুকটাক সারিয়ে ফেলার ব্যাপারে সহজপটুত্ব ছিল। বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে কম্পিউটার দেখে খুব আগ্রহ হল। কয়েক দিন আমার ঘরে কম্পিউটার নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। একদিন আর.এন. মুখার্জি রোডের কোনো এক দোকান থেকে যন্ত্রাংশসমষ্টি কিনে এনে ম্যানুয়ালের সাহায্যে জুড়ে ফেলে একটি পেন্টিয়াম পি.সি খাড়া করে ফেললেন। দাম কম লাগল তো বটেই, জুড়তে গিয়ে যন্ত্রের ভেতরকার সাধারণ স্থাপত্য পুরোদস্তুর জানা হয়ে গেল। অমিতদা ভালো ফোটোগ্রাফার ছিলেন। সেদিন স্মরণসভায় শুনলাম স্বপনদারও নাকি ফোটোগ্রাফিতে ঝোঁক ছিল। শুধু ঝোঁক নয়, বেশ দক্ষতাও নাকি অর্জন করেছিলেন। এই একটা জিনিস আরও দুএকজন কারিগরি-পারঙ্গম মানুষের ক্ষেত্রে দেখেছি। হয়তো ছবি তোলার স্বকীয় আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আলোকবিদ্যা ও ক্যামেরার টেকনিক্যাল দিকগুলি তাঁদের আকর্ষণ করে। শুনেছি, অসুস্থ ও নিজের কামরায় বন্দী স্বপনদার জানলা দিয়ে দেখা পৃথিবীর ফালিটাকে ক্যামেরায় ধরা এক জরুরি অবলম্বন হয়ে উঠেছিল।

চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে মানবিকতার একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে। তার প্রমাণ প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠায় যেন আরও সহজে মেলে। সেই কারণেই বোধহয় নানা যুগে চিকিৎসকরা অনেকে সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এটা এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কেও সত্যি। বহু ডাক্তার এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।* স্বপনদারা সেই প্রথম যুগের কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রভাবিত জেনারেশন নন। তারা সত্তর দশকের বামপন্থী আলোড়নের প্রভাবের ফসল। মনে হয়, সেই প্রভাবেই তাঁর নানান সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

এবার মণিদা সম্পর্কে একটু বলি।

মণিদা

হাবভাবে যেন স্বপনদার একদম বিপরীত। মৃদুভাষী, ঠাণ্ডা, জনসকাশে একটু যেন আড়ালে থাকা স্বপনদার বিপরীতে মণিদার ছিল দাপুটে সরব জোরালো উপস্থিতি।

যতদূর মনে পড়ে, প্রথম আলাপ ২০০৮ সালের গোড়ায়।

তখন আমরা নয়াচরে পেট্রোকেমিক্যাল হাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টার বিরুদ্ধে একটা গুছিয়ে কিছু করার চেষ্টা করছি। তখন হরিপুর, সিংগুর, নন্দীগ্রাম নিয়ে নানারকম প্রতিবাদ প্রতিরোধ। এরপর নন্দীগ্রাম থেকে প্রস্তাবিত পেট্রোকেমিক্যাল নয়াচরে চালান করার কথা শোনা যেতেই এটিও নাগরিক প্রতিবাদের বিষয় হয়ে উঠল। রবীনদা (মজুমদার), মণিদা এবং হয়তো আরও কারুর কারুর মনে হয়েছিল—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নামে যে পেট্রোরাসায়নিক কমপ্লেক্সটি তৈরি হচ্ছে, তার সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের ভাবনা বা আদর্শের তেমন যোগ তো নেইই, বরং প্রকৃতি-পরিবেশ-প্রাকৃতিক সংস্থানের প্রতি মনোযোগী উন্নয়নের যে ভাবনা সারা পৃথিবী জুড়ে সুস্থায়ী ও টেকসই উন্নয়নের মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, এই পেট্রোরাসায়নিক কমপ্লেক্সটি সেই ভাবনার বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। অতএব এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে শুধু সরব প্রতিবাদ নয়, এই প্রয়াসের ও এই জাতীয় প্রয়াস-ভাবনার একটি আদ্যন্ত সমালোচনা-পর্যালোচনা প্রয়োজন। তাই, রসায়ন-ভূতত্ত্ব-ভূবিজ্ঞান-নদীবিজ্ঞান-তটাঞ্চলীয় বিধিনিষেধ-অর্থনীতি প্রভৃতির নিরিখে এবং সব দিক বিচার করে একাধিক সাংবাদিক সম্মেলন ও একটি পুস্তিকা প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত হয়।

অনেক কিছুর মতো এক্ষেত্রেও অভী দত্ত মজুমদারের

** এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল গান্ধীবাদী আন্দোলন ও সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে আধুনিক ডাক্তার ও ডাক্তারির সম্পর্ক ছিল আরও একটু জটিল। গান্ধী নিজে (বিশেষত তাঁর বেশি বয়সে) আধুনিক ডাক্তারদের জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর দারুণ স্নেহের সুশীলা নায়ারকে ডাক্তারি পড়তে উৎসাহ ও অর্থসাহায্য যুগিয়েছেন। কিন্তু রোগ, রোগের কারণ ও রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে আধুনিক 'অ্যালোপ্যাথি' চিকিৎসার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁর জোরালো সমালোচনা সকলেই জানেন। এর কিছু পরিবর্তন হলেও, মৌলিক জায়গায় সমালোচনা তাঁর থেকেই গিয়েছিল। গান্ধীর ভাবনা স্বাধীন ভারতের জনস্বাস্থ্য উদ্যোগকে কতটা অনুপ্রাণিত করেছে সে নিয়ে আলোচনার সুযোগ রয়েছে। আর ভারতের একুশ শতকের আগাপাশতলা ডিজিট্যাল প্রযুক্তি-নির্ভর ভীষণ যান্ত্রিক ভীষণ দামি আধুনিক চিকিৎসা কতটা কী পরিমাণে কীভাবে জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজন মেটাচ্ছে তা নিয়ে ভাবার অবকাশ আছে।*

ভূমিকা ছিল পথিকৃতের। ও আগেই কেমিক্যাল হাব বিষয়ে একটা সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা লিখে ফেলেছিল। সেটি খুব কাজের। খুব জনপ্রিয়ও হয়েছিল। কিন্তু আরও বেশ খানিকটা বিস্তারিত ও গুছিয়ে কিছু করার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিল। এই উদ্যোগে দিশার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে অভী অতটা আগ্রহী না হলে এতগুলি মানুষকে এত দ্রুত একসঙ্গে করা যেত না।

এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য দলিল তৈরির একটি টিম হল। আর সেই টিমের গোড়ার দিকের একটি মিটিং-এ (বোধ হয় পার্থ সেনের ফ্ল্যাটে) মণিদার সঙ্গে আলাপ।

আগেই বলেছি, মণিদা খুব সরব, অন্তত অনেকসময়ই। বহু ব্যাপারে মতামত রয়েছে, এবং সেসব বিষয়ে প্রত্যয় গভীর। দ্রুত মানুষটাকে ভালো লেগে গেল। শুনেছি, জোরালো মতামত এবং, অনেক সময়, ঝাঁঝালো উপস্থাপনার জন্য মণিদার সঙ্গে কারুর কখনো কখনো ঝগড়া হয়েছে। আমার সঙ্গে তেমন কিছু কখনো ঘটেনি। কারণ সম্ভবত এই যে মণিদার মতের সঙ্গে যদি কখনো পার্থক্যও হয়ে থাকে, তাঁর মতের পেছনে ভাবনার জোর ও গভীরতা মনে দাগ কেটেছে। তাছাড়া, মণিদার অনেকটা স্নেহও পেয়েছি।

সাত-সাড়ে সাত বছরের যোগাযোগ। কতবার দেখা হয়েছে? বার চারেক লম্বা সময়ের জন্য দেখা হয়েছে, অনেকক্ষণ ধরে কথা হয়েছে। এছাড়া বোধ হয় কয়েকবার অল্পক্ষণের জন্য দেখা হয়েছে, কম কথা হয়েছে বা প্রায় হয়নি। বোধ হয় বার দশেক ফোন করেছেন। ফোনগুলি বিশেষ পাওনা। খুব ব্যস্ততার মধ্যেও মণিদার ফোন কখনো ভারাক্রান্ত করেনি। কারণ, মণিদা বেকার ফোন করতেন না। কিছু একটা ভাবনা মাথায় এলে সেটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য বা কোনো একটা ফরমাশ করার জন্য ফোন করতেন। আর বিষয় এবং ফরমাশগুলো ইন্টারেস্টিং লাগত। তবে ফোনে কথা বলতে বলতে নানা গল্পগুজব চলে আসত। কিন্তু তুলনায় কমই।

কতরকম বিষয়েই না আলোচনা করতেন! ফ্লোরাইড এবং আর্সেনিকের বিষয়ে সবচেয়ে সাম্প্রতিক গবেষণায় কী পাওয়া যাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লোরাইডের রাজনীতি-অর্থনীতি, দার্শনিক ভাবধারা হিসেবে মার্কসবাদের সমস্যা, কার্ল পপারের ওপেন সোসাইটি অ্যান্ড ইট্‌স এনিমিজ-এর প্রতিপাদ্য, পশ্চিম বাংলায় পরিবর্তনোত্তর সরকারি শাসনের চরিত্র, হোমিওপ্যাথির অবৈজ্ঞানিকতা প্রভৃতি। মাঝে মধ্যে ফরমাশ করতেন। ওঁর মনে হয়েছিল, নানারকম বিষয়ে তথ্য খুঁজে বার করার ব্যাপারে আমার কিঞ্চিৎ পটুত্ব আছে। অতএব কিছু নিজে খুঁজে না পেলে বলতেন। নিশ্চয়ই এমন আরও কাউকে কাউকে বলতেন। কয়েকবার খুঁজে দিতে পারায় খুব খুশি হয়েছিলেন; আমারও তৃপ্তি হয়েছিল।

দারুণ উৎসাহে *ফ্লোরাইড বিষণ: একটি স্বাস্থ্য-ভূতাত্ত্বিক আলোচনা* নামে একটি পুস্তিকা লিখে ফেললেন। দিশা থেকে প্রকাশিত হয়। ছোটো হলেও, এটি হয়তো ফ্লোরাইড-বিষণ নিয়ে বাংলায় প্রথম বই। প্রস্তুত করার সময় সাহায্য করার সৌভাগ্য হয়েছিল। অনেক কিছু শিখেছিলাম।

মারা যাওয়ার দিন কয়েক আগে, ফোন করেছিলেন। কী নিয়ে কথা হয়েছিল কেন যেন মনে পড়ছে না। শুধু এটুকু মনে আছে, গলা একটু ভারী এবং একটু যেন কাশছিলেন। একটু উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলাম। সিগারেট এখনও খাচ্ছেন কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তবে শরীর নিয়ে আর বেশি কথা হয়নি। কয়েকদিন পরে যখন শুনলাম...খুব কষ্ট হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, আর একটু খানিকক্ষণ কথা বললে হত। এরকম কত আক্ষেপ যে জমা হল!

মণিদা যখন যে মত পোষণ করতেন, সেটার মধ্যে শুধু মতের ঝোঁক নয়, প্রত্যয়ের অটলতা ও দৃপ্ত প্রকাশের উত্তাপ থাকত। স্বমত প্রকাশের উৎসাহ দেখে কখনো মনে হত, একটু বেশি গোঁড়া। কিন্তু এটাই মণিদা। তবে যুক্তির মুখে নিজের মত সংশোধন করতে দেখেছি। তাছাড়া সময়ের সঙ্গে ভাবনার পরিবর্তন তো হয়েইছে। মার্কসবাদের সর্বজনীন বিশ্বব্যাখ্যার মোহজাল থেকে বেরিয়ে আসা বৌদ্ধিক বিবর্তনের এক মোক্ষম নিদর্শন। অথচ, বিশ্বব্যাপী সাম্যভিত্তিক মানবমুক্তির প্রেরণা খুঁজেও একজন সমাজমনস্ক বিজ্ঞানকর্মী থেকে গেছিলেন।

কথা শেষে ঃ অন্য কথা

স্বপনদা মণিদা সম্পর্কে লিখতে শুরু করে কিছুদূর এগিয়ে ভেবেছিলাম, এই প্রসঙ্গে ও এই সুযোগে ডাক্তার ও বিজ্ঞনীর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত, তাঁদের সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রভৃতি সম্পর্কে দু'একটি কথা লিখব। শেষে এসে দেখলাম, সেসব লিখতে তেমন ইচ্ছে করছে না। সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কথা মনকে নাড়া দিচ্ছে।

দু'জন মানুষ সম্পর্কে লিখছিলাম। তাঁদের সম্পর্কে

অল্পই জানতাম। তবে যখন লিখছিলাম তখন দু'জন দুই ব্যক্তি, দুটি একক, যাদের সঙ্গে কিছু সময় ধরে এই 'আমি' নামক এককটির যোগাযোগ হয়েছে এবং সেই যোগাযোগ মারফত এই 'আমি' ওই 'ব্যক্তি'দের চিনেছে, এমন একটা প্রাক-ধারণা থেকেই যেন লিখছিলাম। হঠাৎ প্রশ্ন জাগছে, 'ব্যক্তি' বলতে কী বুঝি?

জিনের কোডগুলিতে থাকে কতগুলি প্রবণতা ও সম্ভাবনা। এই প্রবণতা-সমষ্টি ও সম্ভাবনা-সমষ্টির উপর পড়ে নিখিলের নিয়ত প্রভাব। সব প্রভাবের হিসেব আমরা রাখিনা, মনে হয় না কোনোদিন সে সব কিছুকে মানবজ্ঞনের আওতায় আনা যাবে। যে সব প্রভাবের খবর আমরা রাখি, সেগুলির ফলে ঠিক কী কী ঘটল, তার পূর্ণ হদিশও আমাদের অজ্ঞত। শরীর-এন্ড্রোক্রিনতন্ত্র-স্নায়ুতন্ত্রের উপর ফ্লোরাইড, আর্সেনিক, বিসফেনল এ-র কী ও কেমনধারা প্রভাব, শরীরবিশেষে খাদ্য পুষ্টি ও অন্য রাসায়নিকগুচ্ছের ক্রিয়াভেদে প্রভাবের কী প্রভেদ হয়, এসবের খুব মোটাদাগের ধারণা বা ধারণাসূত্র গড়ে উঠেছে, মণিদার মতো মানুষের অনেকটা জানা হয়েছে। হয়তো সেসবের খানিকটা এবং অন্য কিছু জিনিস স্বপনদা এবং অন্য ডাক্তারবাবুদের জানা থাকে। কিন্তু, এহেন কিছুটা-জানার ক্ষেত্রেও, জ্ঞনের পূর্ণতা কোনোদিন সম্ভব বলে মনে হয় না। মানব শরীর, হরমোনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, মগজ প্রভৃতির সব ক্ষমতা-প্রবণতা-সীমা-সম্ভাবনা এবং এগুলির উপর ভৌত জগতের তাবৎ প্রভাব (প্রাকৃতিক বা মানবকর্মকাণ্ড সঞ্জাত) মানুষের শরীর-মগজ-বুদ্ধি-আবেগের উপর কীভাবে ধাক্কা দেয় আর এসবের মোট ফলাফল কী দাঁড়ায় তা জানাবে কোন বিজ্ঞন? আর এর উপর আছে মানবীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতির অমোঘ প্রভাব, জ্ঞন ও অভিজ্ঞতার পরশজাদু। এই সব কিছুর মোট ফল ব্যক্তি নামক যে কাণ্ডসমষ্টি, যা প্রতিমুহূর্তে আরও কোটিগুণ বৃহৎ এক কাণ্ডসমষ্টির অঙ্গীভূত থেকে তারই মধ্যে চলছে ফিরছে, তার গতিপথের সঠিক হিসেব করবে কোন ক্যালকুলাস?

করা যায় না। মোটা-দাগের হিসেবনিকেশ করতে হয়। এক এক ধরনের হিসেবনিকেশ এক একটি এলাকা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়। এসব হিসেবনিকেশের কাউকে বলি এন্ডোক্রিনোলজি, কাউকে বলি সাইকোলজি। বলা বাহুল্য, এগুলির মধ্যে আবার লেনদেন আছে। বহু ব্যক্তির পারস্পরিক যোগাযোগ-সঞ্জাত যৌথ ক্রিয়াকাণ্ডের হিসেবে, অনেক সময় ব্যক্তিকে ভুলে গিয়ে সমষ্টিকে একক ধরে নিলে হিসেব সহজ হয়—সে সব হিসেবের নাম দিই সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, রাজনীতিবিদ্যা। আবার যখন ফিরে আসতে হয় ব্যক্তিতে, তখন সমষ্টির মাপের হিসাবগুলির (ইতিহাস সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি) সঙ্গে ব্যক্তির মাপের হিসেবগুলি (মনস্তত্ত্ব, স্নায়ুবিদ্যা প্রভৃতি) মেলানোর নানা চেষ্টা হয়। এসব করে কখনও মনে হয়, বাঃ! বেশ তো অনেক কিছু বোঝা গেল! আবার কখনও মনে হয়—যাঃ! ঘটনাটি বা মানুষটির অমুক দিকগুলি তো কিছুই বোঝা হল না।

সমাজ, আইন, সংস্কার, মাস্টার, পুলিশ মোক্তার—এসব আমাদের ব্যক্তি নামক একক-কেই চিনতে শেখায়, এত রকমের এত ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রকে নিছক একটি পরিচয়ের মোড়কে পুরে রাখতে শেখায়। বোতলের ভেতরের সহস্র ভূতের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিতে তারা সাধারণভাবে নারাজ। সমাজ ও আইনের চোখে একটা 'ব্যক্তি' নামক এককের হয়তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু এই একটি আইডেন্টিটি কী পারে 'ব্যক্তি'র বহুত্বকে ধারণ করতে? এ সব ক্ষেত্রে সাহিত্যিক যেন আর একটু বেশি সাচ্চা বাস্তবকে দেখেন।

ওয়াল্ট হুইটম্যান লেখেন:

Do I contradict myself?
Very well then I contradict myself,
(I am large, I contain multitudes.)

এই একই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েই কী শঙ্খ ঘোষ নীচের পংক্তিগুলি লেখেন?

কাল ও কথা বলেছিলাম নাকি
আজ কিন্তু সে কথা বলব না।
কাল যে আমি ছিলাম প্রমাণ করো
এই আমি ঠিক সেই আমিটাই কিনা।

একই ধরনের ভাবনা কী বাউল গানের পংক্তিতে?

তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা / ও মন জানো না।

স্বপনদা মণিদার ঘরগুলিতে যারা বাস করতেন তাদের কিছু হদিশ তাঁদের নিকটজনের ও আমাদের সকলের মিলিয়ে ছিল। আরও কারুর কারুর হদিশ তাঁদের নিজেদের জানা ছিল। আর বাকিটা তাঁদেরও ছিল না। কে চেনে, কাকে? চিনে লণ্ঠনের ঢিমে আলোয় পুরোনো নাচঘরের কিছুটা দেখতে পাওয়া যায়, বাকিটা আবছায়া কিংবা অন্ধকারে থেকে যায়।

অকালে চলে যাওয়া আমাদের স্বপনের স্মৃতিতে

সুভাষচন্দ্র গাঙ্গুলী
(subhasganguly@gmail.com)

নিজের চেয়ে বয়সে ছোট কেউ আগে চলে গেলে যাওয়ার বেদনা আরও বেশী করে বাজে। মনে হয় তার তো আমার পরে যাওয়ার কথা। স্বপন আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট ছিল। তার কথা স্মৃতিতে এলে প্রথমেই মনে পড়ে পেশাগত বিষয়ের (চিকিৎসা বিদ্যা) বাইরেও তার বহুমুখী (যন্ত্রপাতি, বিশেষ করে বৈদ্যুতিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি) সৃজনশীলতা, যা ছিল ওর ব্যক্তিসত্বার অন্যতম আকর্ষনীয় দিক, এবং যা আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করত।

স্বপনের এই অকাল প্রয়াণের (১৯ জানুঃ, ২০১৫) পর তার স্মরণ সভায় (৩১ জানুঃ, ২০১৫, কলকাতার মৌলালী যুব কেন্দ্রে) বড় পর্দায় দেখান নানা সময়ে তোলা নানা ফটোর বিষয় নির্বাচনে তার শৈল্পিক চোখ ও মন এবং ছবি তোলার দক্ষতা চমৎকার ভাবে ধরা পড়ে।

যত দূর মনে পড়ে স্বপনের নামের সাথে আমার প্রথম পরিচয় বোধ হয় ৭০ দশকের গোড়ার দিকের কোন এক সময় থেকে— সে সময়কার ছাত্রদের সামাজিক কর্মকান্ড ও 'বীক্ষণ' নামে 'ছাত্র-যুবদের' মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত একটি পত্রিকার সূত্রে, যার সাথে নেপথ্য থেকে আমিও যুক্ত ছিলাম। স্বপনের সাথে সরাসরি প্রথম পরিচয় আশীর দশকের মাঝামাঝি থেকে। সে সময় মাঝে মধ্যে আমাদের বাড়ীতেও ওর আসা যাওয়া চলেছে। তখন ওর সাথে দু'এক বার গুড্ডি'ও (মালবিকা) এসেছে। নানা কথাবার্তা ও গল্পস্বল্প হ'ত। আমাদের বাড়ীতে দু'একটা বিগড়ে যাওয়া যন্ত্র সারান'র ক্ষেত্রে স্বপনের হস্তক্ষেপ কাজে এসেছিল। পরবর্তীকালে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র (বি-ও-বি) বৃহস্পতিবারের সাপ্তাহিক আড্ডাতে ওর সাথে দেখা হ'ত এবং সেখানে ও প্রায়ই তেলেভাজা-মুড়ি নিয়ে হাজির হ'ত ও সবাই মিলে তা ভাগ করে খাওয়া হ'ত।

ছড়ান-ছেটান এরকম টুকরো টুকরো কিছু স্মৃতি মনে ভেসে আসছে। যেমন, সুদীপ্ত'র (সরস্বতী) কাছে শুনেছি ছাত্র অবস্থায় সুদীপ্ত তার নিজের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের (জীব-পদার্থবিদ্যা—Bio-Physics) প্রয়োজনে চিকিৎসা বিদ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট শারীরবিদ্যা সংক্রান্ত কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর, নিজের স্পষ্টতার প্রয়োজনে, অনেক সময় স্বপনের কাছে জানতে চাইত। উত্তর না জানলে (যে কারুর বেলাতেই যার চেয়ে স্বাভাবিক কিছু হতে পারে না) স্বপন সে কথা নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিত। সুদীপ্ত'র খুব ভাল লাগত। শুনে আমারও খুব ভাল লেগেছিল। আবার এরই সাথে দু'একটা অন্য জাতের স্মৃতিও আছে। হয় তো অতিরিক্ত সারল্যের কারণে খেয়াল না করেই স্বপন দু-এক সময়ে কাছের কারও ইচ্ছেতে কাছেরই অন্য কারও অপ্রীতিকর বিস্ময়ের কারণ হয়েছে।

যে পরিমান দীর্ঘ রোগভোগের যন্ত্রণা তাকে সইতে হ'ল ও সে সময়টা জুড়েই একই সাথে কর্মস্থলের (কলেজে পড়ান) দায়িত্ব সামলে যে অপরিসীম উৎকণ্ঠা, বেদনা ও ছোটাছুটির মধ্য দিয়ে গুড্ডিকে যেতে হ'ল কিন্তু শেষ রক্ষা হ'ল না, মনে মনে সেই যন্ত্রণা ও ব্যথার অংশীদার হলেও তার তীব্রতা অন্যদের পক্ষে অনুভব করা বোধ হয় কঠিন। স্বপেনর বন্ধুরা শুরুতে ভীড় করে ছুটে এসেছ ও, যত দূর জানি, তারপর যথাসাধ্য সাহায্য করতে থেকেছে।

প্রায় আড়াই বছর (২৪ অক্টোবর ২০১২) আগে আমার সমসাময়িক ৪০ বছরের পুরোন এক অ-বঙ্গভাষী অতি কাছের বন্ধুর (সীতারাম শাস্ত্রী) হঠাৎ বিদায়-নেওয়ার ধাক্কা সামলে নেওয়ার জন্য নিজেরই প্রয়োজনে কল্পনা করার চেষ্টা করেছিলাম অন্যের কাছ থেকে ধার করা নিচে উপস্থিত করা বাণী যেন আমাদের সবার উদ্দেশে—তার পরিবার, তার বন্ধু ও তার অন্য নিকট জন, যারা এখনো জীবিত—তারই বিদায় বেলার না বলা বাণী। সেই বাণী তখন তার চেনা অন্যদের সাথে চিঠি-পত্রের মধ্য দিয়ে ভাগ করে নেবার চেষ্টা করেছিলাম। স্বপনের বেলাতেও যেন একই রকম মনে হচ্ছে। তখন যাদের সাথে বিনিময় হয়েছিল তারা অনেকেই অ-বঙ্গভাষী। কাজেই অনুবাদ ছাড়া তাদের কাছে পৌঁছান যেত না। কিন্তু সেই প্রয়োজন না থাকলেও অনুবাদ করতে গেলে সেই বাণীর মধ্য দিয়ে নিজের যেন একটা যাত্রা চলে, যাতে সেই বাণী যেন নিজের আরও ভেতরে চলে আসে। আর তখন তা অন্যদের সাথেও ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে।

এই কথাটি মনে রেখো

এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।
শুকনো ঘাসে শূন্য বনে আপন-মনে
অনাদরে অবহেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলাম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।।
দিনের পথিক মনে রেখো, আমি চলেছিলেম রাতে
সন্ধ্যাপ্রদীপ নিয়ে হাতে।
যখন আমার ও-পার থেকে গেল ডেকে ভেসেছিলেম ভাঙা ভেলায়।
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান-২য় খন্ড (বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪১২)

Please Keep in mind these words of mine.

Please Keep in mind these words of mine.
in your this laughter and playing
I did sing my songs when the withering leaves were falling.
On the dry grass, in the empty forest just on my own
Not cared for, neglected
I did sing my songs when the withering leaves were falling.

Wayfarers of the day, do remember. I was walking through night
With evening lamps of offering in my hand.
When from the other side came the passing call
Up on the broken raft I floated.
I did sing my songs when the withering leaves were falling.

(অনুবাদ : সুভাষ চন্দ্র গাঙ্গুলী)

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচা কেনা,
মিটিয়ে দেব গো, মিটিয়ে দেব লেনা দেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে—
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।
যখন জমবে ধুলা তানপুরাটার তারগুলায়,
কাঁটালতা উঠবে ঘরের দ্বারগুলায়, আহা,
ফুলের বাগান ঘন ঘাসের পরবে সজ্জা বনবাসের,
শ্যাওলা এসে ঘিরবে দিঘির ধারগুলায়—
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।

তখন এমনি করেই বাজাবে বাঁশি এই নাটে,
কাটবে দিন কাটবে,
কাটবে গো দিন আজও যেমন দিন কাটে
তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি—আহা,
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহু-ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান-২য় খন্ড (বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪১২)

When my footprints will no longer fall this way

When my footprings will no longer fall this way.
No longer shall I row my ferry-boat on this bank.
Will be finished up with my buying-selling.
Shall settle, settle for sure, all my receipts and payments,
My going in and out of this market-place will stop-
Then even if you may not recall me.
Even if you may not call me up while looking on at the stars.
When dust will gather on the strings of that tambourine.
The thorny creepers will crawl up the doors, Oh!
The flower garden will wear on the apparel of dense grass.
Befitting dwelling in the woods,
Mosses will appear and surround the edges of the ponds.
Then even if your may not recall me.
Even if you may not call me up while looking on at the stars.

Then, flutes will go on playing their tune, same as today in this ongoing drama
Days will pass. will pass for sure.
Will pass as they pass today too. Oh!
The ferry boats from banks to banks will be filled up as they do today.
Cattle will graze and cowboys will play around on the meadows over there
Even if you may not recall me then.
Even if you may not call me up while looking on at the stars.

Then, who syas that I am not there in that morning.
This very me will be playing in all plays-Oh!'
You will address me by new name; will bind me in new embrance.
That same ever present me will come and go.

(অনুবাদ : সুভাষ চন্দ্র গাঙ্গুলী)

With Best Compliments From :

AIMBEE

36/1/1 Pulin Khatik Road (Tangra Road). Kolkata-700015
Contact No. : 9330446711 (2p.m. to 8p.m.)

Service for

Pest Control ■ Dusting & Cleaning ■ Book Preservation
■ White Ant Treatment ■ Termite Control ■ General Order Supply

References :

Calcutta University (Departments, Libraries, Laboratories, Accounts Office. etc.)

Banks :

Central & State Government Offices

আমার ভাই মণি

মায়া দত্ত

আমাদের আদি নিবাস ছিল অধুনা বাংলা দেশের পাবনা জেলায়—বড়াল নদীর তীরে গোপালনগর গ্রামে। বাবাদের জমিদারি ছিল সেখানে, যদিও জমিদারির আয় বিশেষ ছিল না। আমার বাবা জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার মোক্তারি পাস করেছিলেন, কিন্তু ঐ পেশায় অহরহ অনৃতভাষণ করতে হয় ব'লে আদালতের কাছ ঘেঁষেন নি। বাবা থাকতেন ধানেঘাটা কাছারী বাড়ীতে—আমাদের গ্রাম থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে। যেদিন বাড়ী আসতেন, সাইকেলে চেপে আসতেন। মনে আছে, বাবা মাঝে মাঝে লোকের মাধ্যমে বাঁকে চাপিয়ে বিলের বড় বড় মাছ বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন। বাড়ীর সব কাজ মা-ই সামলাতেন। মা ইন্দুমতী মজুমদার ময়মনসিংহের অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগিনী। তিনি চাইতেন যে ছেলেমেয়েরা ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখুক। মনে পড়ে, ছোট বেলায় গ্রামের বাড়ীতে লণ্ঠনের আলোয় মা আমার দাদা ষষ্ঠী মজুমদারকে রামায়ণ ও মহাভারত প'ড়ে শোনাতেন। শুনেছি, পাবনায় ইছামতী নদীর ধারে মা জমি কিনেছিলেন। গ্রামে কলেজ ছিল না—তাই ছেলেমেয়েরা যাতে পাবনায় থেকে কলেজের শিক্ষা লাভ করতে পারে তার জন্য তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন। মণীন্দ্র নারায়ণ বা মণির ডাকনাম ছিল কালু—হয়ত' ওর গায়ের রঙ দাদা ও আমার চেয়ে শ্যামলা ছিল ব'লে বাবা-মা এই ডাকনাম রেখেছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, কালুর ভাল ক'রে জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার আগেই মা আমাদের তিন ভাইবোনকে রেখে প্রয়াত হয়েছেন। মায়ের মুখে একটা ব্রণ হয়েছিল। বাবা বারণ করা সত্বেও মা সে'টা খুঁটে দিয়েছিলেন। পেনিসিলিন-চিকিৎসা তখনও সেখানে চালু হয় নি, ফলে মা সেপিটসিমিয়ায় মারা গেলেন। মায়ের মৃত্যুর পরে আমি আর ভাই কালু গ্রামের মধ্যে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতাম। আমাদের দু'জনের মধ্যে খুব ভাব ছিল এবং দু'জনেই আমাদের গম্ভীর দাদাকে সমীহ ক'রে চলতাম। যদিও আশে-পাশে খুড়ীমা-জেঠিমা ছিলেন, তাঁরা আমাদের খুব একটা শাসন করতেন না। অবশ্য তাঁরা আমাদের গতিবিধির উপর নজর রাখনে। পরবর্তী সময়ে বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন এবং আমাদের আরও ভাই-বোন জন্ম নেয়।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিভক্ত হয়ে গেল। আমরা হয়ে গেলাম নিজভূমে পরবাসী। ১৯৪৮ সালে আমরা উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুরে চলে এলাম। তিন মাস সেখানে থাকার পরে আমরা হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে আসি। ভদ্রেশ্বর স্টেশনের কাছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মার্কিন সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত ছাউনির টালি-চালের আড়াইখানা ঘরে আমাদের নতুন জীবন শুরু হল। বাবা মোক্তারি করেন নি ঠিকই, তবে তাঁর ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল, হাতের লেখাও ছিল চমৎকার। পশ্চিমবঙ্গে এসে তিনি কলকাতায় ৩, হেস্টিংস স্ট্রীটে, 'ক্যালকাটা উইকলি নোট্স'-এ যোগ দেন। উনিশ ও বিশ শতকের কলকাতায় এই আইনী জার্নালের অপরিসীম গুরুত্ব ছিল। পরে তিনি কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে চাকরী নিয়েছিলেন।

ভদ্রেশ্বরে তখন মেয়েদের কোন বিদ্যালয় ছিল না। তেলিনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রভাতী সেসনে যখন বালিকা বিদ্যালয় খোলা হ'ল, তখন আমার পিসতুতো দাদা শৈলেন মজুমদার অর্থাৎ মন্টুটা আমাকে ওখানে ভর্তি করিয়ে দিলেন। আমরা ভাইবোনেরা ষষ্ঠীদাকে বড়দা আর মন্টুদাকে দাদা ব'লে ডাকতাম। দাদাই কালুকেও ১৯৪৯ সালে তেলীনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ে সরাসরি ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করিয়েছিলেন। আমাদের সব ভাইবোনের জীবনেই অকৃতদার এই দাদার প্রভাব ছিল অপরিসীম—কালু শুধু নয়, আমরা সবাই দাদাকে দারুণ ভালবাসতাম। দাদা লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিলেন, ম্যাট্রিকুলেশনে বাংলায় লেটার পেয়েছিলেন। দমদম বিমানবন্দরে চাকরী দিয়ে তাঁর

কর্মজীবনের সূচনা, তারপর আনন্দবাজার ও আজকাল পত্রিকায় চাকরী করেছেন, স্থানীয় বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকও হয়েছিলেন । কিন্তু তাঁর খামখেয়ালীপনার জন্য কোন চাকরীতেই তিনি থিতু হতে পারেন নি।

ছোটবেলা থেকেই কালু চোখে কম দেখতো। দাদা ব্যাপারটা দেখে তখনকার দিনের বিখ্যাত চক্ষুবিশেষজ্ঞ ডাঃ বলাই মিত্রকে দিয়ে ওঁর চিকিৎসা করান। তুলনামূলক বিচারে কালুর চেয়ে বড়দা বেশী মেধাবী ছিলেন—কিন্তু তিনি ছিলেন ফাঁকিবাজ। চাকরী থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে তিনি আইনে স্নাতক হয়েছিলেন। বড়দা ও কালু দু'জনেরই ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। কালু বড়দার মত অতটা মেধাবী ছিল না ঠিকই, কিন্তু তার স্বভাব ছিল বড়দার ঠিক বিপরীত। তার ছিল অসাধারণ জেদ, পরিশ্রম ক্ষমতা, একাগ্রতা আর অধ্যবসায়। বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় ভাল ফল করার জন্য কালু প্রতি বছরই পুরস্কার পেত। আমাদের আর্থিক দুরবস্থার জন্য বাবা সব পাঠ্য বই ওকে কিনে দিতে পারতেন না। তাই বছরের শুরুতেই তিনি কালুর মাধ্যমে প্রধান শিক্ষকের কাছে প্রয়োজনীয় বইয়ের তালিকা পাঠিয়ে দিতেন, যেগুলো পুরস্কার হিসেবে ওকে দেওয়া যেতে পারে। প্রধান শিক্ষক তাঁর কথা রাখতেন। ম্যাট্রিকুলেশনের পর কালু চন্দননগর কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ও কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে রসায়নে সাম্মানিক নিয়ে স্নাতক হ'ল। কালুর ছিল পরীক্ষায় ভাল ফল ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়াবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। সে ১৯৬০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে রসায়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করে এবং ১৯৬১ সালে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপকের চাকরী পায়। এক বছর সেখানে অধ্যাপনার পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌনে দু'বছর রসায়নে গবেষণা করার পরে আবার আড়াই বছর বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা-১৯৬৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডক্টরেট ডিগ্রি দিলে ১৯৬৬ সালের শুরুতে সে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের চাকরী পায়। বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে ২০০৩ সালে সে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন হিসেবে অবসর নেয়।

চোখের অবস্থা এবং স্বাস্থ্য প্রতিকূল ছিল, কিন্তু সে দিনরাত পড়াশোনা, লেখালেখি অথবা দৌড়ঝাঁপ করত—প্রচণ্ড খাটতে পারত। 'প্রগতি বার্তা' পত্রিকার জন্য মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াত দেখে আমি ওকে বকাবকি করতাম। বলতাম, 'ঐ সময়টা ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার দিকে নজর দিলে তো পারতিস'। ও জবাব দিত না। কালু কোন দিন পরকালে, ঈশ্বরে বা জ্যোতিষবিদ্যায় বিশ্বাস করে নি—তাই সে এই জীবনেই সব কাজ শেষ করতে চেয়েছিল। কোন ধর্মগুরুর জীবনী বা বাণীতে তার কোন ভক্তি ছিল না। বাবা মারা গেলে সে তাঁর শ্রাদ্ধ বা পারলৌকিক কাজ কিছুই করে নি। মাথা কামিয়ে নেড়া হওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। অনেক তথাকথিত মার্ক্সবাদীকে দেখেছি নাস্তিক্যবাদের বিশ্বাসী ব'লে বড়াই করলেও বাস্তব আচরণে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে। কালু কিন্তু ছিল আদ্যন্ত নাস্তিক এবং এ'ব্যাপারে কোনদিন সে আপোষ করে নি। অপার্থিব কোন বিষয়ে তার বিশ্বাস ছিল না। আমি নাস্তিক নই। ওকে বলতাম, 'তুই নিশ্চয় জ্যোতি দেখবি'। ও মাথা নেড়ে বলত, 'কক্ষনো তা হবে না'। এবং সত্যই তা' হয় নি—পূর্ণ নাস্তিক্য নিয়ে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

কালু জ্ঞানবয়সে মাকে কাছে পায় নি। ও আমাকে খুবই ভালবাসত—মনে হ'ত, মায়ের স্থানেই আমাকে ও বসিয়েছিল। আজও মনে পড়ে, সায়েন্স কলেজে গবেষণার পর অনেকদিন সন্ধ্যায় ও আমার বাড়ীতে এসে আমার এবং আমার শাশুড়ীর সঙ্গে গল্প করত—আমার শাশুড়ীও ওকে খুব ভালবাসতেন। আমি অনেকদিন ধরেই অসুস্থ। কালু মাঝে-মধ্যেই কল্যাণী থেকে ভদ্রেশ্বরে এসে আমাকে দেখে যেত। হঠাৎ কী যে হ'ল, ও চলে গেল। আমি পড়ে রইলাম স্মৃতিভার বুকে নিয়ে।

মণিদা

শুভাশিস মুখার্জি
(smbmbg@gmail.com)

রসায়ন বিজ্ঞানের অনেক প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচিত মানুষদের সঙ্গে আমার স্কুল জীবনেই পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো—সৌজন্যে আমার দাদা। তিনি রসায়ন বিজ্ঞানের একজন প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচিত মানুষ।

মণিদা রসায়ন বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও মণিদার সঙ্গে আমার পরিচয় কিন্তু এই পরিচিত রাস্তা ধরে ঘটেনি। আমার ছোটোবেলা উত্তর কোলকাতার যে পাড়াটায় কেটেছে, সেই পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন সুব্রত দা, যার ছোটো ভাই আমার স্কুল এবং পায়ে-বল খেলার বন্ধু। সেই সুব্রতদার মাধ্যমেই আমার মণিদার সঙ্গে পরিচয়-সুব্রতদা কল্যাণীতে রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ছিলেন।

এই ঘুর পথে আমি মণিদার "ব্রাদার" হয়ে উঠি, যে সম্বোধনটি তিনি আমৃত্যু বজায় রেখেছিলেন।

আমার বন্ধু ছোটন-রা পাড়া ত্যাগের আগে পর্যন্ত প্রায় নিয়মিতই মণিদা আমাদের পাড়াতে আসতেন—ফলে দেখা সাক্ষাৎ ঘটতো। মাঝে মাঝে উনি ছোটনকে ক্লাস এইট-এর রসায়ন দেখিয়ে দিতেন—বেশ কয়েকবার ফাঁকতালে আমিও মেঝেতে বসে পড়ে মণিদার কাছ থেকে তালিম নিয়েছি। সেই তখনই মণিদা রসায়নের ছোটো-খাটো পরীক্ষা প্রদর্শন করে শিক্ষাদানকে প্রাণবন্ত করে তুলতেন।

তারপর আমরাও পাড়া-ছাড়া হই এবং সময়ের এক অমোঘ নিয়মে যোগাযোগের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ আবশ্যিক হয়ে ওঠে। কিন্তু কৈশোরের সেই অনন্য স্মৃতি কখনই মুছে যায়নি।

কল্যাণী সীমান্ত লোকাল-হীন সময়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কল্যাণী শহরে পাড়ি জমানো সহজসাধ্য ছিলোনা—।

শহর-গঞ্জর দিগন্তে তখনও অটো-রিক্সা দৃশ্যমান নয়। সাইকেল রিক্সাই মরুভূমির প্রায় একমাত্র বাহন। আধা-আত্মীয়তার সম্পর্কে বাঁধা একজন চিকিৎসক সপরিবারে কল্যাণীবাসী হলেন-কল্যানীর কোনও একটি সরকারি হাসপাতালে চাকরি নিয়ে। সেই আত্মীয়র বাড়ি যাওয়ার ফাঁকে মণিদার পুরোনো বাড়িতে গেছি অল্প কয়েকবার কিন্তু এবারের সূত্রে ছিলো আমার দাদার ভাই হিসেবে। মণিদা ততদিনে কল্যাণীতে বেশ শিকড় চালিয়ে স্থিতু হয়ে পড়েছেন।

তারপর মাঝখানে বিরাট (প্রায় বছর দশেক হবে) এক সময়ের ফাঁক-যে সময়টায় মণিদার সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে প্রায় যোগাযোগহীন হয়ে পড়ে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মণিদার সঙ্গে "দ্বিতীয় দফা"-র সম্পর্ক গড়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের গণবিজ্ঞান আন্দোলন, বন্দীমুক্তি আন্দোলন ইত্যাদির সূত্র ধরে।

পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা গণবিজ্ঞান আন্দোলন সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরের পেছনে তাত্ত্বিক রসদ জোগানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, মণিদা তার অন্যতম। শুধু তাত্ত্বিক লেখা নয়—সুদীর্ঘ এবং মনোজ্ঞ আলোচনা মারফৎ-ও মণিদা তাঁর বক্তব্য প্রাঞ্জল করতেন স্বভাব-দক্ষতায়। গণবিজ্ঞান-জনবিজ্ঞান লোকবিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনায় বাংলায় লেখা আমার পড়া প্রথম তাত্ত্বিক প্রবন্ধটির রচয়িতা মণিদাই। এই সময় মণিদা লিখেছেন প্রচুর স্থানীয় পত্রিকায়, বিজ্ঞান সংগঠন গুলোর অনিয়মিত প্রকাশনায় বা বুলেটিনে এবং অবশ্যই পুস্তিকার আকারে।

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা গঠিত হয়েছে এবং সংস্থার মুখপত্র হিসেবে দ্বিভাষিক এবং দ্বিমাসিক মুখপত্র, "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী" পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। বড়দের মুখে শোনা পত্রিকাটির অনন্য সংক্ষেপিত নাম, বি-ত্ত-বি তখন আমাদের মতো অর্বাচীনদের কাছেও সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। সেই "ওরাল ট্র্যাডিশন" আজও সমানে বহমান।

কালানুক্রম মেনে মণিদার বিষয়ে লিখে যাওয়া বেশ কঠিন, স্মৃতি মেদুরতা এবং স্মৃতির ছলনা এই দুই কারণেই। তাই সে চেষ্টা না করে পরপর কিছু কথা লিপিবদ্ধ করাই শ্রেয়-অন্তত ঘটনাগুলির সত্যতা নিয়ে যাতে বির্তক না ওঠে।

আমি যখন রহড়া কলেজের ছাত্র, তখন রহড়া-র মিশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের কলেজের শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের একাংশের এক আদর্শগত বিরোধ উপস্থিত হয়। মিশন কর্তৃপক্ষ শিক্ষক নির্বাচন এবং শিক্ষাকর্মী নির্বাচনে সতর্ক ছিলেন—মিশনের নিশ্চিন্ত এবং প্রশ্নহীন আনুগত্যের অসুস্থ আবহাওয়ার বাইরের মতাদর্শে বিশ্বাসী কালাপাহাড়রা যাতে তাদের ধর্ম এবং সেবা ব্যবসার অন্তরালে অন্যায় এবং ভোগের জগতটকে বেপর্দা না করে দেয়। কিন্তু সর্ষের মধ্যে ভূতের প্রাদুর্ভাব ঠেকানো ছিলো মিশন কর্তৃপক্ষের সাধ্যাতীত—অতএব বিরোধ উপস্থিত হলো অচিরেই। যে কজন সজ্জন শিক্ষাবিদ এই সংকটে কলেজের শিক্ষকদের পাশে থেকে নিরলস সমর্থন (শুধু পাশে থাকাই নয়, সক্রিয় সমর্থন) দিয়েছেন, মণিদার নাম মনে পড়ছে সর্বাগ্রে। এই সূত্রেও বেশ কয়েকবার মণিদার সঙ্গে মোলাকাত ঘটেছে। যতদূর মনে পড়ছে, বিবৃতি দেওয়ার বাইরেও, দু একটি অবস্থানে শিক্ষকদের সমর্থনে মণিদাকে দেখেছি।

আমরা যখন রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র, তখন বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার এবং বি-ত্ত-বি-র স্বর্ণযুগ। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কোনও না কোনও কর্মসূচী-রবীন চক্রবর্তীর ঘরে চাঁদের হাট। যথারীতি মণিদার উপস্থিতি, লেখা, লেখা ঘিরে বিতর্ক। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-শক্তি-দূষণ-পরিবেশ নিয়ে নানান জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, লেখা এবং বিতর্ক চলছে শিবিরের বাইরের মতান্ধ মানুষদের সঙ্গে, বিতর্ক চলছে শিবিরের মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শ এবং চিন্তাধারার মধ্যে। নানা বিষয় নিয়ে মণিদা লিখছেন-ফুকুয়োকার দর্শন থেকে সতীমার মেলা। স্মল ইজ বিউটিফুল থেকে ব্যারী কমোনার। বিতর্ক হচ্ছে সুজিত দাস বা মোহিত রায়দের সঙ্গে। কোনও বই পড়লেই মণিদা সেই বই নিয়ে আলোচনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন। বেশ কয়েকবার বলেছেন যে নতুন বিষয় বা নতুন দৃষ্টিকোণ দিয়ে তিনি প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তাই আলোচনা।

হয় বিজ্ঞান কলেজে নয়তো কল্যাণীতে নতুন পড়া বইটি বা বইগুলির বেশ কয়েকটি ফোটোকপি করে, সযত্নে বাঁধিয়ে ব্যাগভর্তি করে কোলকাতায় আনতেন-বন্ধুদের জন্য, তাদের পড়ার জন্য এবং পরবর্তীতে আলোচনার জন্য। আমার সৌভাগ্য যে প্রাপকদের সেই তালিকায় এক সময় আমিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ি। কী না দিয়েছেন মণিদা আমাদের, কোন্ বিষয়ই বা বাদ গেছে তাঁর সন্ধানী চোখ আর প্রখর মস্তিষ্কের আণুবীক্ষণিক অবলোকনে।

মণিদার কাছেই প্রথম জানতে পারি "রাইট লাইভলি এওয়ার্ড"-এর কথা—অর্চনা গুহ-র মামলার সূত্রে, যে মামলার তিনি একজন উৎসাহী অংশগ্রহণকারী ছিলেন নানা বিস্তৃত অর্থে। যখন এই মামলার রায় বের হলো, তখন এই বিষয়ে বক্তব্য রাখার স্বভাবতই প্রথম মানুষ ছিলেন মণিদা। আমাদের দুর্ভগ্য, প্রযুক্তিগত বিভ্রাটে কোলকাতায় মণিদার স্মরণ সভায় বন্ধুদের অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতার কথাগুলি শ্রাব্য অবস্থায় পরিবেশন করা সম্ভব হয়নি!

দূষণ নিয়ে মণিদার নিজস্ব বক্তব্য ছিলো। বক্তব্য ছিলো বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে। এক সময়ে সামাজিক চাপে যতটা, তার চেয়েও বেশি উচ্চতম ন্যায়ালয়ের চাপে পশ্চিমবঙ্গে পরিবেশবিদ্যা স্নাতকস্তরের পাঠক্রমে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পড়ানো শুরু হলো।

পাঠ্যপুস্তক বা পাঠ্যপুস্তকের রচয়িতা বললে আমাদের চোখের সমানে যে বিভ্রান্তিকর এবং নেতিবাচক প্রতিমা ভেসে ওঠে, সংস্কারহীন এবং কাজের ক্ষেত্র বাছাই-এ দৃপ্ত মণিদার চৈতন্যে সেই ছবি অনুপস্থিত ছিলো। অবশ্য অভিজিৎদা তার কিছুদিন আগে থেকেই পদার্থ বিজ্ঞানে অসাধারণ সমস্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে পাঠ্যপুস্তক রচনার এক উন্নততর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে। রবীন এবং মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের যুগলবন্দীতে পরিবেশ বিষয়ে এক অসাধারণ পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হলো। দুই মজুমদারের সেই প্রবল ব্যস্ততা এবং শ্রমের মধ্যেও বি-ত্ত-ধি-র কাজে ঘাট্‌তি পড়েনি।

মণিদার যাত্রাপথ আঁকাবাঁকা মনে হলেও তার এক স্থির অভিমুখ ছিলো। প্রবন্ধ, ছোটো পুস্তিকা, বড় পুস্তিকা থেকে পাঠ্যপুস্তক। এর পর তিনি জনসচেতনার পুস্তক প্রণয়নে ব্রতী হয়ে পড়লেন। বিষয় পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিক। মনে পড়ছে বইটির প্রথম সংস্করণ প্রস্তুতি পর্বের কয়েক টুকরো কথা। অতি সামান্য কিছু সাহায্যই মাত্র করতে পেরেছিলাম। একদিন ডিটিপি এবং চার-রং-এ ছাপার জন্য ডিজিটাল প্রিন্ট তৈরি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো। মণিদা ছাপাখানার জগতে এই উথাল-পাথাল ঘটনার প্রযুক্তিগত বিপ্লব সম্পর্কে উৎসাহী হওয়া সত্ত্বেও সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারেননি। উৎকৃষ্ট ছাপার উপযুক্ত মান কিছুতেই স্পর্শ করা যাচ্ছেনা। এ হেন অবস্থায় একদিন মণিদা সৌমেনদার ময়দা-র বাড়িতে উপস্থিত। ঘটনাচক্রে সেদিন আমি ওখানে-আগের রাত

থেকে আছি। নানান রকম কৌশল, টোটকা সহযোগে শেষ পর্যন্ত উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনো গেলো। সারাক্ষণ মণিদা ঐ বয়েসেও সঙ্গ দিয়েছেন। পরবর্তীকালে নতুন সংস্করণ হয়েছে, মণিদা বইটির বিন্যাস এবং পরিমার্জনা—দুই-ই সম্পন্ন করেছেন।

আর্সেনিক-এর পর মণিদা হাত দিয়েছেন ফ্লোরাইড সংক্রান্ত আলেচানায় এবং "টক্সিসিটি"-র বাংলা করলেন বিষণ। ফ্লোরাইড বিষণ নিয়ে তাঁর পুস্তিকা বেশ সাড়া ফেলেছিলো। পূর্ণ দৈর্ঘের বই প্রকাশের যাবতীয় উদ্‌যোগ তাঁর গ্রহণ করা হয়ে গেছিলো। আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে। এলাহাবাদের সোসাল সায়েন্স এ্যাকাডেমি মণিদাকে একটি সাম্মানিক পুরস্কার দেয়। গৌহাটিতে এ্যাকাডেমি-র একটি বার্ষিক অধিবেশনে মণিদার আমন্ত্রিত বক্তৃতা ছিলো। যাতে সবাই সেই বক্তৃতা শুনতে পায় সেই জন্য অন্য অধিবেশন গুলির সময় সারণীর অদলবদল ঘটানো হয়। ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট মণিদা তাঁর বক্তব্য রাখেন।

মণিদার জন্যই গ্রামে-গঞ্জের অনেক মানবাধিকার কর্মী জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদটি মাতৃভাষায় পড়তে পেরেছেন। সেই অনবদ্য অনুবাদে মণিদার উৎসাহের অন্ত ছিলো না।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনেও মণিদার অসাধারণ ভূমিকা অনেকের স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মণিদার দৃষ্টিকোণের বিরোধী পক্ষও মণিদার অকৃত্রিম অণুশীলনে মুগ্ধ ছিলো। মণিদার চরিত্রে অন্য একটি দিকও ছিলো। তথাকথিত বিপরীত পক্ষের একজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক যখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন, তখন মণিদাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজনে আর্থিক সহায্যের আবেদনে দুজন মানুষের একজন স্বাক্ষরকারী ছিলেন।

পোখরাণ ২ নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের পর বিকিরণ-জনিত দূষণ ও স্বাস্থ্যহানী বিষয়ে যখন চর্চা তুঙ্গে, তখন একদিন মণিদা হন্তদন্ত হয়ে বিজ্ঞান কলেজে আমার ঘরে এসে হাজির। মণিদার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো তেজস্ক্রিয় বস্তুর দীর্ঘ অর্ধ-জীবনকাল-এর প্রভাবে তাদের ক্ষতিকর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী এবং মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌলর (যেমন প্লুটোনিয়াম) অর্ধজীবনকাল বেশ দীর্ঘ, অতএব তা প্রাকৃতিকভাবে লভ্য তেজস্ক্রিয় মৌলর চেয়ে বেশিদিন জীবজগতে ক্ষতি চালিয়ে যাবে। ঠিক তেমনি ভাবে মনুষ্যসৃষ্ট ক্ষতিকর রাসায়নিক যৌগ সমূহ দীর্ঘদিন পরিবেশ-প্রতিবেশে অবস্থান করে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারে। দুজনে উৎসাহী হয়ে "রেডিও-মিমিক" বিষয়ে বিস্তর তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। মণিদা বিপুল উৎসাহে এই বিষয়ে পড়তে থাকেন।

মণিদা পড়তে পারতেন বহু বিষয়, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো আন্তঃবিষয়ক ক্ষেত্রে বিশেষ বিষয়ে অধীত বিদ্যার সফল প্রয়োগ ঘটাতে পারতেন। তাই যখন কেমিক্যাল হাব নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধছে, তখন ক্ষতিকর রাসায়নিক নিয়ে মণিদা তাঁর এই বিদ্যার্জন কাজে লাগিয়ে ছিলেন।

ব্যবহারিক এবং পরীক্ষামূলক রসায়ন শিক্ষণ-প্রণালী নিয়ে মণিদা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। বস্তুত তিনি তাঁর বসত বাটিতেই এমন এক শিক্ষাদান সংস্থার পত্তন করেন। বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র এবং যাতায়াতের সুবাদে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সার্থক উত্তরসূরী হওয়ার সুপ্ত বাসনা হয়তো মণিদাকে অজান্তেই উদ্বুদ্ধ করতো। তাই হয়তো শেষ বয়সে এসে মণিদা কী এক অমোঘ আকর্ষণে আচার্য রায়ের চর্চিত বিষয়গুলিকে আপন করে নিয়েছিলেন। হয়ত কেমিক্যাল হাব-এর মতো দূষণ প্রবণ প্রস্তাবিত শিল্প তালুকের নামকরণ আচার্য রায়-এর নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার সাংঘাতিক অপচেষ্টা তাঁকে ক্রুদ্ধ করে থাকবে। দূষণহীন রসায়ন বা গ্রীন কেমিস্ট্রির সন্ধানে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। মণিদার সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ প্রাথমিক তথ্য, বিভিন্ন লেখার খসড়া উদ্ধার করলে বিজ্ঞান আন্দোলনে তা স্থায়ী অবদান বলেই পরিগণিত হবে।

মণিদার বয়সী এবং মণিদার পেশার মানুষদের আত্মজরা বিদেশে থাকে পড়াশুনার সূত্রেই। তাই অনেকের মতো মণিদাও বিদেশে পাড়ি দিতেন তাদের টানে এবং আহ্বানে। এটুকুই অন্য অনেকের সঙ্গে মণিদার মিলের জায়গা।

মণিদা বিদেশ যেতেন গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে, পাগলের মতো বই, তথ্য, দলিল সংগ্রহ করতে এবং দুর্লভ আকরগ্রন্থ ঘেঁটে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তথ্য আহরণ করতে। ফলত তাঁর "বিদেশ ভ্রমণ" হয়ে উঠতো "শিক্ষার উদ্দেশ্যে পাড়ি"। বিদেশে পৌঁছে তিনি নতুন এবং বিচিত্র বই-এর সন্ধান করতেন। বড় বড় ই-মেল পাঠিয়ে চিত্তাকর্ষক বই-এর নাম জানতে চাইতেন—আমাদের কার কার কী কী বই লাগবে,

তার ফরমাস গ্রহণ করতেন অকুণ্ঠ চিত্তে।

তাঁর এই রকমই একটি বিদেশযাত্রা আসন্ন ছিলো। যাত্রার দিন-ক্ষণ স্থির হওয়ার পর একদিন তিনি ফোন করে বললেন যে ব্রাদার তুমি একটা বড় তালিকা পাঠাও—এই শেষবার যাওয়া। বলেছিলাম এইবার না হয় বেড়ানো এবং ভ্রমণ থেকে শিক্ষার অ্যাজেণ্ডা নিয়ে পাড়ি দিন। যতদূর মনে পড়ছে মৃত্যুর দিন পাঁচেক আগে আবার অস্থির তাগাদা-বইএর তালিকা চাই-ই চাই। বললেন সাগরপারে পৌঁছেই যেন প্রত্যাশিত ই-মেলটি হস্তগত হয়।

মণিদার ছেলের বিয়ের দিন, মণিদার প্রতিষ্ঠিত, তাঁর বাড়িতে অবস্থিত সংস্থার ভেতরের ঘরে একরাশ বই-এর মাঝখানে মণিদার শান্ত-সমাহিত মূর্তি এখনও চোখের সামনে ভাসে। সেই অবধারিত কালো কোট, চশমা-উত্তেজনার চূড়ান্ত মুহূর্তে কথা আটকে যাওয়া। মেরুদণ্ডী প্রাণী মানুষের অমেরুদণ্ডী বর্গভুক্ত হওয়ার এই প্রবল হাওয়াতে মণিদা এক মূর্তিমান ব্যতিক্রম—স্ববিরোধী জীবনযাপনের বিপরীতে এক প্রবল বিবেকী কশাঘাত।

মণিদাদের মতো অর্জুনরা অপাতত মহাপ্রস্থানের যাত্রীদলে যোগ দিয়েছেন—তাঁদের রেখে যাওয়া বৃক্ষশীর্ষের শরপূর্ণ তূণ সংগ্রহে উৎসাহী পরবর্তী প্রজন্ম প্রয়াসী হবেই-তাদের হতেই হবে। মণিদা যে হয়েছিলেন!

মণিদা বা বিশুদ্ধদার মতো মানুষদের আমরা আজকে আমাদের চারপাশে পাইনা কেন? ভালো মানুষ, সচেতন চিত্ত, সংবেদনশীল মনন, দক্ষ এবং কুশলী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষরা কি ডারউইনকে কলা দেখিয়ে বিলুপ্ত হচ্ছেন? নাকি আমাদের এক গুরুতর ভ্রান্তি, ভুল পথ পরিহারে অনীহা, মতাদর্শে আস্থাহীনতা—এসবের সম্মিলিত অভিঘাত এক সর্বব্যাপী শূন্যতার জন্ম দিয়েছে। সত্য সম্ভবত এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী এক ধূসর অঞ্চলে লুকিয়ে আছে। বি-ও-বি সম্পর্কে সবার আগ্রহ জেগেছিলো তার পশ্চাতে বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা বা এসডব্লুএফ-এর প্রবল উপস্থিতির জন্যই। এক স্থিত মতাদর্শ, মানব-কৃষ্টির এক উৎকৃষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর চিরন্তন যাত্রার অংশ বলে নিজেদেরকে মনে হতো। বস্তুত এই সময়ে সম-মনস্ক আরও কয়েকটি সংগঠনও ক্রমে আত্মপ্রকাশ করে এবং হাত ধরাধরি করে যাত্রা শুরু হয়।

সাংগঠনিক প্রয়াস আগুয়ান হলেই সংগঠকদের মধ্যে মতাদর্শগত বিভেদ, তাত্ত্বিক অবস্থান এবং অনুশীলনের প্রক্রিয়া নিয়ে আলাপ আলোচনা-সংঘাত অবশ্যম্ভাবী—আমাদের সংগঠনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। যে ধৈর্য, যে নমনীয়তা নিয়ে এই সমস্যাকে সংকটের স্তরে যেতে না দিয়ে নিরসনের পথে অগ্রসর হওয়া ঘটতে পারতো-বিবদমান কোনও গোষ্ঠীই সেই ঔদার্য দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। ফল হয়েছে আত্মক্ষয়ী বিতর্কে প্রত্যেকের জোর কমেছে—সেই অতীতের মতো কাজের এই ময়দানটি আজ শূন্য। প্রেতনৃত্যের পশ্চাৎভূমি এবং বিষবৃক্ষের বীজ তখনই প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করতে শুরু করেছে।

এক সময় এসে অবশ্যই ভিতরপানে তাকানোর পালা শুরু হয়েছে। দুটো সমাধান নিয়ে পরীক্ষা চলেছে। সংগঠনহীনতা এবং উৎকৃষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর বিষয়টি আপাতত শিকেয় তুলে রাখা কিন্তু প্রশ্ন করার সংস্কৃতি বজায় রাখা। ফলে আমরা পড়ছি না-সংস্কৃতির গাড্ডায়-অতীতের পদক্ষেপ বিচারে নাকচের অবস্থান থেকে যাত্রা শুরুর ভিত্তিভূমি রচনা। আমাদের জোর পড়েছে স্থানীকে, ছোটো স্তরে-সংশ্লেষণ মার খেয়েছে। পক্ষান্তরে, দৃঢ় সংগঠন, দুর্দমনীয় শৃঙ্খলা (বা অন্যথায় শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে ফেলা) এবং বিস্তৃত লক্ষ্যই ধ্রুব ধরে নিয়ে পথ চলা। কিন্তু শৃঙ্খলা পদে পদে শৃঙ্খল হয়ে পথ রোধ করেছে। পায়ে পায়ে পিছু হটা শুরু এবং এক সময় নাটকের আঙিনা শূন্য করে কুশীলবদের গৌরবময় পশ্চাৎ অপসরণ!

আমরা চাই বা না চাই, যতই অপছন্দের বিষয় হোক না কেন, নেতির নেতি এমন এটি সর্বজনীন সূত্র, তা আমাদের বিশেষ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবস্থার যে গুণগত দশা তাতে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা রাখতে হবে। কিন্তু আমাদের অনুশীলনে শৃঙ্খলা পরায়ণতা আর অধীনতা সমার্থক, স্বাধীনতার মোড়কে স্বেচ্ছাচারিতার অনুশীলন। মাৎস্যান্যায় বা মহাপ্রলয়ের চিহ্ন দিগ্‌বলয়ে দৃশ্যমান হলে মানুষ গৃহাভিমুখী হয়—ভিত্তি খোঁজে দর্শনের মধ্যে, আদিতে ফিরতে চায়। কিন্তু সেখানেও নেতির নেতি ক্রিয়াশীল। তাকে সম্মান জানিয়েই আমরা ফিরি শিকড়ের সন্ধানে-মূল সূত্র খুঁজি, পড়ি, অনুসন্ধান করি এবং অবশ্যই যূথবদ্ধভাবে, নইলে চারাগাছকে ছাগলে মুড়িয়ে খেয়ে যাবে!

ড. মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

যাঁর প্রয়াণে আমাদের সংস্থার অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

ড. মজুমদার (আমাদের অনেকের মনিদা) ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত রসায়নের অধ্যাপক। তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে। পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে চলে আসা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান মনিদাকে সংগ্রাম করে নিজের ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে হয়েছে। অন্য অনেকের মতো তিনি তাঁর শিকড়কে ভুলে যান নি। তিনি ছিলেন সমাজসেচতন এবং সমাজ পরিবর্তনের এক নিরলস বিজ্ঞানকর্মী।

শিক্ষা ও গবেষণা-পেশাগত এই কাজের বাইরে অগুনতি বিষয়ে ছিলো তাঁর আগ্রহ ও অংশগ্রহণ। আশির দশকের গণবিজ্ঞান আন্দোলনের তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ সংগঠক। সমাজ ও বিজ্ঞান চেতনা প্রসারের উদ্দেশ্যে পাক্ষিক পত্রিকার (প্রগতি বার্তা) প্রকাশ ও সম্পাদনার কাজ করেছেন বহু বছর। আশি-নব্বই-এর দশকে রাজ্যে পানীয়জলে আর্সেনিক দূষণ প্রায় মহামারীর আকার নিলে তিনি নিজেকে ওই সমস্যার থেকে দূরে রাখতে পারেন নি। আর্সেনিকের বিষে আক্রান্ত মানুষদের দুঃখ দুর্দশা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের, সমস্যার ব্যাপকতা জানতে আর্সেনিক কবলিত জেলাগুলিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সমস্যার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে পড়াশুনা করে সকলকে আর্সেনিকের সমস্যা সম্বন্ধে সজাগ করতে বই লিখে নিজের খরচে প্রকাশ করলেন। আর্সেনিক নিয়ে কাজ করার সময় পানীয়জলে ফ্লুরাইড বিষণের বিষয় তিনি জানতে পারেন। সরজমিনে তদন্ত করে সমস্যাটির ব্যাপকতা ও মানুষের শরীরে ফ্লুরাইড বিষণের প্রভাব জানতে তিনি বীরভূম, ঝাড়খন্ড, বিহারের কয়েকটি জেলায় চলে যান। বয়স তাঁকে হার মানাতে পারেনি। সব কাজেই তাঁর প্রাক্তন ছাত্র ড. অমূল্য মন্ডল যথাসম্ভব সঙ্গ দিয়েছেন। ফ্লুরাইড বিষণের ক্ষেত্রিয় অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবার তিনি ওই বিষয়ে ব্যাপক পড়াশুনা শুরু করেন। এসবেরই ফল হলো আর্সেনিক ও ফ্লুরাইড বিষণের ওপর তথ্যবহুল তাঁর লেখা বই। বইটির গুণবত্তা বিচার করে জাতীয়স্তরের প্রকাশনাসংস্থা (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট) ওইটি প্রকাশ করে। বইটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

গবেষণাগারে কাজের জন্য দরকার এমন অনেক রাসায়নিক যেগুলির প্রস্তুত ও বিপণনকারি হলো মূলত বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি। প্রতিযোগিতা না থাকায় ওই সব কোম্পানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ওই সব রাসায়নিক যথেচ্ছ দামে বিক্রি করে। স্বভাবতই এতে গবেষণার কাজ ব্যাহত হয়। তিনি দেখলেন এই সমস্যার প্রতিকার করতে হলে আমাদের নিজেদেরই ওই রাসায়নিকগুলি তৈরি করা দরকার। রাসায়নবিদ হিসেবে তিনি দেখলেন ওইগুলি তৈরি করা খুব কঠিন কাজ নয়। বিষয়টি নিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করেন। কিন্তু কারোর থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে ঠিক করেন নিজেই ওই রাসায়নিকগুলির কয়েকটি তৈরি করবেন। বার্ধক্য জনিত জরাগ্রস্ত শরীর নিয়ে প্রয়াণের কয়েক বছর আগে ওই উদ্দেশ্যে নিজের বসতবাড়িতে নতুন নির্মাণ করেন এব সেখানে একটি ল্যাবোরেটারি তৈরি করে কাজ শুরু করে দেন। তাঁর আশা ছিলো তাঁর প্রয়াণের পরেও যেনো ওই কাজ চালু থাকে। ওই উদ্দেশ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নামে তাঁর ল্যাবোরেটারির নামকরণ করেন এবং একটি অছিপর্ষদ গঠন করেন।

যা মনে করবেন তিনি সেটাই করবেন—এই ছিলো তাঁর চরিত্রের একট বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগত ভাবে বঞ্চিত মানুষদের সমস্যা সমাধানের সাধ্যমত চেষ্টা করা ছিলো তাঁর আকেরটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর মানসকন্যা পম্পাকে জীবেন প্রতিষ্ঠিত করতে পেরে তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন। নীচতা, স্বার্থচেতনা ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবালীর প্রতি মানুষের উদাসীনতা উদারচেতা এই মানুষটিকে মানসিকভাবে পীড়া দিতো। এই ব্যাপারে মাঝে মাঝেই তিনি দুঃখ প্রকাশ করতেন। মনিদা গান শুনতে ভালো বাসতেন। তাঁর পছন্দের গানগুলি অন্যদের শোনানোর জন্য গানের সিডি কিনে পছন্দের মানুষদের বিতরণ করতেন। তেমনি কোনো বই তাঁর পছন্দ হলে ওই বইয়ের ফটোকপি করে নিয়ে আসতেন পড়ানোর জন্য।

আশির দশকের শুরু থেকে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, উৎস মানুষ, গণবিজ্ঞান কেন্দ্র, ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম ইত্যাদি সংগঠনগুলি ঘিরে যে সব গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিলো তাদের কাজকর্মের মাধ্যমেই মনিদার সাথে আমার পরিচয় ও সখ্যতা গড়ে ওঠে। বাঁকুড়ায় আমাদের হাসপাতাল তৈরির সময় থেকেই তাঁর বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়। এই কর্মকাণ্ডে তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। আমাদের হাসপাতাল-এর সংগঠক ফাউন্ডেশন ফর হেলথ অ্যাকশনের তিনি একজন অছি হিসেবে সংগঠনে যোগ দেন। বন্ধু বান্ধবদের দেখানোর জন্য ও তাঁদের সহযোগিতা পাওয়ার আশায় তাঁদের নিয়ে বারে বারে আমাদের হাসপাতালে আসতেন। ভাবতে কষ্ট হয় তিনি আর আসবেন না।

একবার মনিদা সস্ত্রীক আমেরিকা ও ইউরোপের কয়েকটি দেশে বেড়াতে এবং ওই দেশের লাইব্রেরিগুলিতে গেছেন তথ্যের সন্ধানে। আবার ছোটো ছেলে ও মেয়ের কাছে আমেরিকায় যাওয়ার যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই সব শেষ হয়ে গেলো।

এক অজনা কারণে মনিদা পেটের ব্যথায় কষ্ট পেতেন। কয়েকবার অনেক ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও তাঁর রোগ নির্ণয় করা যায় নি। চিকিৎসায় মাঝে মধ্যে উপশম হতো। কিছুদিন বাদে ওই কষ্ট আবার ঘুরে আসতো। উপশমের আশায় ডাক্তারি পরামর্শ নেওয়ার জন্য প্রায় রোজই ফোন করতেন। কয়েক দিনের নীরবতার পর একদিন বিকালে বন্ধু অসিত চক্রবর্ত্তি ফোন করে জানালো-মনিদা নেই। খবরটি শুনে সাময়িকভাবে হতবাক হয়ে গেলাম। আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা অনুভব হলো। মনে হলো মনিদা বড়ো আকস্মিক ভাবে চলে গেলেন।

আমার বিশ্বাস আমাদের মতো অনেকের কাছেই মনিদার মৃত্যু 'পাহাড়ের মতো ভারি' বলে মনে হবে। পরিচিত সকলের কাছেই মনিদা শ্রদ্ধেয় ছিলেন এবং থাকবেন। শোকাহত পরিবারকে আমরা সমবেদনা জানাই।

পীযূষকান্তি সরকার
(drpksarkar2010@gmail.com)
আমাদের হাসপাতাল, বাঁকুড়া
ফাউন্ডেশন ফর হেলথ অ্যাকশন।

GOUR KRISHNA CHATTERJEE
Govt. Contractor
Nagendranagar 3rd Lane
P.O.- KRISHNAGAR,
Dist.- NADIA
Pin-741101 (741101)
[WEST BENGAL]

মণিদা—যেমন দেখেছিলাম

কল্যাণ রুদ্র

(rudra.kalyan@gmail.com)

মণিদার সাথে আমার পরিচয় ২০০০ সালে; যতদূর মনে পড়ছে অগাস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে। গঙ্গার ভাঙনে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী ও আখেরিগঞ্জ এলাকা তখন বিপন্ন। আগুয়ান গঙ্গা গিলে খাচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম। জমি ও বসতি হারিয়ে হাজার হাজার মানুষ তখন আশ্রয়ের খোঁজে হন্নে হয়ে ফিরছেন। কেউ আশ্রয় নিয়েছেন পথের ধারে, কেউ খোলা আকাশের নীচে; আবার কিছু মানুষ চলে গেছেন নদীর মাঝে জেগে ওঠা নতুন চরে। নতুন করে বাঁচার চেষ্টা যা কিছু চলছিল সবই নিজেদের উদ্যোগে, ওই প্রক্রিয়ায় সরকারের কোন ভূমিকা ছিল না। বিক্ষুব্ধ মানুষেরা তাদের দাবীদাবা আদায়ের জন্য গড়ে তুলেছিল এক নাগরিক কমিটি। ওদেরই আহ্বানে আমরা কয়েকজন গিয়ে হাজির হয়েছিলাম মুর্শিদাবাদের সেই প্রত্যন্ত সীমান্তে। আমার সাথী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক মনতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্য সবাইকে আগে থেকে চিনতাম না আর সেই অচেনাদের দলেই ছিলেন মণিদাও।

আলাপ হতে সময় লাগে নি। আমাদের বয়সের পার্থক্য বন্ধুত্বের মাঝে কোন বাধা হয়ে দাঁড়াল না। লক্ষ্য করলাম নদী প্রকৃতি-পরিবেশ নিয়ে তাঁর গভীর আগ্রহ। আমাদের পরস্পরিক আলোচনায় মণিদা কখনও শিক্ষক কখনও মনযোগী ছাত্র। কী ভাবে নদী ভাঙন প্রতিরোধ করা যায়, এই ভাঙনের জন্য ফরাক্কার ব্যারেজ কতটা দায়ী, কীভাবে এই ভাঙন-দুর্গত মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায়,এই সবই আমরা আলোচনা করছিলাম। আলোচনার পরতে পরতে মণিদার প্রজ্ঞ ও প্রখর বিশ্লেষণ ক্ষমতা আমাকে মুগ্ধ করছিল।

সেই শুরু, তারপর এক দশকের বেশি সময় ধরে আমাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। ২০০৭ সালে নয়াচরে ক্যামিকাল হাব তৈরির প্রতিবাদে পরিবেশ-প্রেমী মানুষরা যখন সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলছে তখনও মণিদা প্রতিবাদে সোচ্চার। সদ্য প্রয়াত অধ্যাপক অভী দত্ত মজুমদারের বয়স তখনও ৪০ বছর হয়নি, মণিদা ৭০। এক দিকে সিঙ্গুরে বহুফসলি জমিতে টাটাদের ন্যানো কারখানা, অন্যদিকে নয়াচরে কেমিক্যাল হাব ও হরিপুরে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট—এই সব প্রস্তাবকে ঘিরে বাংলা তখন উত্তাল। অভীরই উৎসাহে গড়ে উঠল 'টিচার্স এন্ড সায়েন্টিস্ট এগেন্সট ম্যাল ডেভেলাপমেন্ট' বা টাসাম নামে এক সংগঠন। অভীর লেখা পুস্তিকা 'কেমিক্যাল হাব-এক নিঃশব্দ ঘাতক' তখন মানুষের হাতে হাতে ঘুরছে। আমরা মাঝে মাঝেই নানা বিষয়ে আলোচনা করছি। বিশেষভাবে মনে আছে 'পরিবেশ ২০০৯'-এর কথা। অনেক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বসল কর্মশালা; এর পর পরই সাহা ইনস্টিটিউটে 'তোমার পরিবেশকে জানো' নামে অন্য একটি কর্মশালায় ছাত্র-ছাত্রীরা যোগ দিল অতি উৎসাহে। অনেকদিন পর পশ্চিমবঙ্গে পরিবেশ আন্দোলন এক নতুন মাত্রা পেল। মণিদা কল্যাণী থেকে কলকাতায় সবসময় আসতে পারতেন না তবে ফোনে যোগাযোগ রাখতেন নিয়মিত; পরামর্শ দিতেন অভিভাবকের মতো। মণিদা আর অভী ছিলেন সেই বিরল প্রকৃতির শিক্ষক যারা ক্রমাগত বিজ্ঞন ও সমাজের মেল-বন্ধনের পথ খুঁজতেন।

সেই সময় মণিদা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিলেন। তাঁর গবেষণার বিষয়টি ছিল 'বাংলায় আর্সেনিক-প্রকৃতি ও প্রতিকার'। একই সাথে চলছিল রাঢ় বাংলার ভূগর্ভস্থ জলে ফ্লোরাইড বিষণ নিয়ে তাঁর গবেষণা। মণিদা মাঝে মাঝেই আমাদের বাড়ির ল্যান্ড-লাইন-এ ফোন করতেন, সকাল আটটা নাগাদ। ওই সময় ফোন বাজলেই আমার স্ত্রী বলতেন—'তোমার মণিদা বোধহয়'। আলোচনা হত গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক ও জনস্বাস্থ্যের উপর তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে। তিনি বলতেন জলসিক্ত-বাংলা আজ জলেরই কারণে গভীর সংকটের মুখোমুখি। আমার কাছে শুনতেন বেঙ্গল বেসিনের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস আর বিশ্লেষণ করতেন কী ভাবে গত চার দশকে বদলে গেছে ভূগর্ভস্থ জলের রসায়ন। কীভাবে বিষিয়ে গেছে আমাদের খাদ্যশৃঙ্খল, হারিয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। আমি তখন নীরব ছাত্র আর মণিদা শিক্ষক।

২০১৪ সালের ৮ জুন সকালে ওই ল্যান্ডলাইনেই খবর এল 'মণিদা আর নেই'। ৭৭ বছর বয়সে কোন মানুষের মৃত্যুকে অপরিণত বলা যায় না। তবু বলব মণিদাকে আমাদের দরকার ছিল আরও অনেক দিন।

সকাল আটটার সেই ফোনটা আর কোন দিন আসবে না—ভাবলে আজও বিষণ্ন লাগে।

স্মৃতির মণি কোঠায়

সিদ্ধার্থ গুপ্ত
(siddharthagupta@rocketmail.com)

উচ্চতা কত? বোধহয় মাত্র পাঁচ দুই বা পাঁচ তিন। চোখে মোটা লেন্সের সাবেকি ফ্রেম-এর চশমা-প্লাস পাওয়ার। বিরলকেশ মাথায় গুছি কয়েক সাদা চুল। অতি সাধারণ ইস্ত্রি না করা শার্ট প্যান্ট। আর যেটা খালি চোখে দেখা যায়না—বুকের খাঁচার মধ্যে একটা বিরাট মাপের হৃদয় আর মাথার করোটির ভিতর প্রবল যুক্তিবাদী মস্তিষ্ক, বয়সের সঙ্গেও যাতে অন্ধবিশ্বাস, অপসংস্কার, অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার কোনো মেদের প্রলেপ পড়েনি। আমাদের মণিদা।

মণিদাকে যে খুব কাছ থেকে দীর্ঘদিন দেখেছি, এমন নয়। দীর্ঘদিন তাঁর সহকর্মী হিসাবে কাজ করেছি, এমনও নয়। দেখা হয়েছে নানা সভা সমিতিতে; বিজ্ঞান দরবারে (যার পোষাকি নাম সেমিনার); শিক্ষা-মূলত বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে আলোচনা সভায়, যেখানে তিনি বক্তা আমি শ্রোতা। আমাদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক নানা অনুষ্ঠানে মণিদা ছিলেন প্রায় নিয়মিত। রসায়ন থেকে জীব রসায়ন এবং তার থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল প্রভূত। সকলেই জানেন আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড দূষণ এবং মানবশরীরে তার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তার বিরল গবেষণা ও পুস্তকের কথা।

বিশেষত ফ্লোরাইড দূষণের উপর তাঁর সারা জীবন ব্যাপী কাজ ভবিষ্যতের গবেষকদের পাথেয় যোগাবে।

২০১৪ সালে Indian Social Science Congress-এর একটি শাখা Indian Peoples Science Congress-এর অধিবেশন বসেছিল আহমেদাবাদে। যে সাদামাটা অতিথিভবনে আমাদের রাখা হয়েছিল, তাতে আমাদের পাশের ঘরেই ছিলেন মণিদা। আমি গিয়েছিলাম সস্ত্রীক—সঙ্গে ডা: পুণ্যব্রত গুণ ও ডা: তাপস ভট্টাচার্য্য। সন্ধ্যার পরে মণিদা অনেক সময়ই এসে বসতেন আমাদের ঘরে। নানা বিষয় আড্ডা চলত। জমত বিতর্ক।

সাধারণভাবে আমি বহু যুক্তিনিষ্ঠ মানুষকে দেখেছি জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়ে ভাববাদী হয়ে যেতে, ধর্মবিশ্বাসী হয়ে যেতে। জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত, স্বজন বিয়োগ, দুরারোগ্য অসুস্থতা অনেক সময়ই বহু প্রাক্তন বিপ্লবী বা সামাজিক আন্দোলনের নেতাকে ধর্ম বিশ্বাসী করে তোলে। নিরালম্ব জীবনের প্রান্তে এসে সারাজীবনের যুক্তিবাদী নাস্তিকতা প্রথমে অজ্ঞেয়বাদ ও শেষে আস্তিকতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু ঐ কদিনের আলাপচারিতায় দেখেছিলাম সেই বয়সেও মণিদার চিন্তাভাবনা খাপখোলা তরবারির মতো। বয়সের ভারে শরীর হয়ত কিছুটা শ্লথ হয়েছে। চর্ম হয়েছে লোল, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। কিন্তু সময় তাঁর যুক্তিবাদী মস্তিষ্কে থাবা বসাতে ব্যর্থ। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আর কোনো মানদণ্ড সেখানে নেই। আমার স্ত্রী আগে মণিদাকে চিনত না। ওর সঙ্গে মণিদার দারুণ জমে গেল। নানা বিষয়ে আলোচনা। বাল্য ও কৈশোর নিয়ে, দারিদ্রের সঙ্গে কঠোর লড়াই করে শিক্ষাপ্রাপ্তি, রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ, অধ্যাপনা গবেষণার জগৎ, বীক্ষাণাগারের বাইরে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি প্রভৃতি। বিজ্ঞান চর্চার রাজনীতি—যে রাজনীতিতে শাসকশ্রেণী সাধারণ মানুষকে নির্বোধ করে রাখতে চায়, অবৈজ্ঞানিক যুক্তিবুদ্ধি হীন কুসংস্কারে ডুবিয়ে রাখতে চায়, তার বিরুদ্ধে মণিদার জীবনব্যাপী জেহাদ। বিজ্ঞানকেই হাতিয়ার করে এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নিপীড়িতদের ক্ষমতায়নের সংগ্রাম। সর্বহারার পক্ষে লড়তে গেলে সবাইকেই কি বন্দুক হাতে তুলে নিতে হবে? গণ বিজ্ঞানের হাতিয়ারও যে সমান শক্তিশালী তা মণিদা করে দেখিয়েছেন। ব্রেখট্ এর গ্যালিলিও নাটকে একটি উক্তি ছিল "বাপু হে, আকাশে চন্দ্রসূর্যের চালচলন মানুষ যদি বা কিছু জানতে পেরেছে, নিজের শাসকদের চালচলন আজও তার অজানা।" একজন রসায়নবিদ হয়েও প্রথাগত প্রশিক্ষণে চিকিৎসক না হয়েও জনস্বাস্থ্যে মণিদার বিপুল আগ্রহ; পরিবেশ দূষণে 'শাসকদের চালচলন' তিনি জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন। 'মগজে কারফিউ' জারির বিরুদ্ধে তাঁর বৌদ্ধিক প্রতিরোধ আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করছিল।

প্লেনারি সেশনে মণিদার বক্তৃতা ছিল। এক গ্রামীণ দরিদ্র ছাত্রের জ্ঞানের জগতে মুক্তিলাভের কাহিনি বলছিলেন অকপটে। বলছিলেন "আমি মূর্খ ছিলাম। বিজ্ঞানকে কেবল পাঠ্যবই-এর পাতায় খুঁজে বেড়াতাম। রসায়নকে খুঁজতাম ফর্মুলা ও ইক্যুয়েশন এ। ধীরে ধীরে বুঝলাম সারা দুনিয়াটাই বিজ্ঞানের গবেষণাগার। মানুষই রসায়নের প্রধান উপাদান।" অপূর্ব জীবনবীক্ষা, আত্মোপলব্ধি! প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথের উত্তরসূরী মণিদাকে সেদিন নতুন করে জানলাম। চিনলাম।

ঈশ্বর ও ভক্তিবাদের নানা প্রসঙ্গ উঠত মাঝখানের অবসরে। এক টেবিলে জড়ো হতাম আমরা।

মণিদা আপোষহীন। ধর্মচর্চা, গুরুবাদ, ঈশ্বরভক্তি, ধর্মকে নিয়ে ব্যক্তি, সামাজিক ও রাষ্ট্রিয়স্তরে মাতামাতি থেকে সংঘর্ষ—ওই সব কিছুরই বিপ্রতীপে মণিদা যুক্তিতে অটল। ইস্পাতের পাতে মরচে পড়ে না। একদিন উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে আমাদের এক মাতাজির আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়, তাঁরা আমন্ত্রণ করেছেন বলে। ওখানে গিয়ে বিষয়টা বুঝতে পারি। আমরা প্রতিবাদ করে বেরিয়ে আসি। মণিদা তীব্রভাবে উদ্যোক্তাদের ভৎর্সনা করেন এই বুজরুকির বিরুদ্ধে। উদ্যোক্তারা ক্ষমা চান।

বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রাম ভগবানপুরে আমাদের শিক্ষক (উভয় অর্থেই) ডা: পীযূষকান্তি সরকার গড়ে তুলেছেন 'আমাদের হাসপাতাল'—অল্প খরচে যুক্তিসংগত চিকিৎসার জন্য। মণিদা ছিলেন তার অন্যতম ট্রাস্টি। কলকাতা সংবাদপত্রের পাতায় লিখেছেন সেই হাসপাতালের পরিচিতির জন্য, এই উদ্যোগে সহায়তার আহ্বান রেখে।

বর্তমানে এই রাজ্যে যাঁরা গণবিজ্ঞান আন্দোলনে, কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত—তাঁদের সবার পিতামহ মণিদা। আমার বন্ধু প্রখ্যাত কণা বিজ্ঞানী অভী দত্ত মজুমদারের জীবন অবসান হয়েছে অকালে। ডিসেম্বর ২০১৩ তে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে। মণিদা অনেক পরিণত বয়সে গেলেন। তবু অভীর মতো তাঁর কাজও অপূর্ণ থেকে গেলো।

অভীর মৃত্যুর পর একটি ছোট শ্রদ্ধার্ঘ্যে লিখেছিলাম "অভীর নামে নাম দিয়েছি একটি তারার।" অনাদি অসীম ব্যোমলোকের দিকে তাকিয়ে অভীর নামে চিহ্নিত করা তারার পাশেরটির নাম দিলাম, আমাদের শিক্ষক ড. মনীন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের নামে।

বিধিবদ্ধ ঘোষণা

পত্রিকার নাম	:	বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রকাশনার ভাষা	:	বাংলা ও ইংরেজি
প্রকাশনার স্থান	:	বি ২৭/১ কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কলকাতা-৮৯
প্রকাশ কাল	:	ত্রৈমাসিক
প্রকাশকের নাম	:	রবীন মজুমদার
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকনা	:	বি ২৭/১ কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কলকাতা
মুদ্রকের নাম, জাতি, ঠিকানা	:	ঐ
সম্পাদকের নাম, জাতি, ঠিকানা	:	ঐ
প্রেসের নাম ও ঠিকানা	:	ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে

আমি, শ্রী রবীন মজুমদার, ঘোষণা করছি যে, উপরি-উক্ত বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতো সত্য।

স্বা : রবীন মজুমদার

প্রকাশক, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার স্মরণে

অশোকেন্দু সেনগুপ্ত
(asokendus@gmail.com)

প্রায়শ শুনি—আমাদের কালে শিক্ষার মান ছিল কত উন্নত, আর একালে? ছ্যাঃ। ওরা কিছুই শেখে না।

কথাটা সত্যি কী?

সেই কবে এদেশে ইংরেজরা দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা বাতিল করে আনল পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা। ইংরেজিশিক্ষা ও ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার সুযোগ বাড়ানোর ছলে তারা এদেশে শিক্ষার যে আয়োজন শুরু করল আমরা আজও সেই পবিত্র ধারায় অবগাহন করে চলেছি। কেবল শিক্ষা নয়, আমাদের সংস্কৃতিও প্রভাবিত হল, ওরা কাঁদলে আমরা কাঁদি, ওরা হাসলে আমরা হাসি। শিক্ষার কথা আগে সারি।

বুনিয়াদি স্তর থেকে গবেষণা স্তর পর্যন্ত আমাদের একালের শিক্ষার কাঠামোটা ইউরোপ থেকে নকল করা। অনেকটা যেন চকচকে দোকানে ঢুকে ডান-বাম খেয়াল না রেখে এবং মাপ না বুঝে জুতো কেনা।

সেকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গরম হাওয়ায় আমাদের পূর্বগামীরা কেউ কেউ খুব কৌশলে ও সতর্কতায় দুধ আলাদা করে নিয়ে খাবার চেষ্টায় সফল হয়েছিলেন, প্রতিভাও ছিল, প্রয়োজনও ছিল, আর ছিল ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির খান কয়েক গাঁট যা তাঁদের কেউ কেউ অস্বীকার করতে চাননি। তাই সে আমলে সাক্ষরতার হার কম ছিল বটে, শিক্ষার সুযোগও ছিল কম, কিন্তু, সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি পুষ্ট হয়েছিল বেসরকারি উদ্যোগ, কিছু মানুষ সেই ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও প্রকৃত শিক্ষিত হতে পেরেছিলেন এবং আমরা পেয়েছিলাম গান্ধি, রবীন্দ্রনাথের মতো চিন্তাবিদদের।

ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থার পদাঙ্ক অনুসরণ করেও আমাদের শিক্ষার ফসল বিশ্বের নজর ও শ্রদ্ধা আদায় করেছিল। তবু, সে শিক্ষাব্যবস্থা যে ত্রুটিপূর্ণ তা সেকালের আলোচনাতেই স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল। তাই সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বা দুঃখের কথা এই যে সে সংস্কার না হয়েছে গান্ধী নির্দেশিত পথে, না অনুসৃত হয়েছে রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন। সংস্কারেও আমরা ইউরোপীয় রীতি-পদ্ধতি, তাদের প্রয়োজন, তাদের পরামর্শ (যদি না বলি নির্দেশ) মেনে এগিয়েছি। মানতেই হবে যে বহু ত্রুটি রয়ে গেছে, জমা হয়েছে বহু জঞ্জাল।

কিন্তু ভালো কিছুই হয়নি বা পাইনি, একথা তো মানা যায় না। সাক্ষরতার হার অনেক অনেক বেড়েছে (একশ' শতাংশ নয় তা নিয়ে ক্ষোভ থাকাও স্বাভাবিক); শিক্ষার সুযোগ বেড়েছে বহুগুণ; বেড়েছে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা, একালের শিক্ষকরাও অনেকে পরিশ্রম করছেন (ফাঁকিও দিচ্ছেন অনেকে, সংখ্যায় তাঁরা বিপুল তবে সেকালেও বহু শিক্ষক ফাঁকি দিতেন এবং অন্তত শতাংশের বিচারে তেমন তফাৎ ঘটেনি); গবেষকরা নতুন নতুন দিগন্ত ছুঁয়ে চলেছেন। স্বাধিনতার পরেও বেশ কিছু বছর উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ গমন খবরে বা বিজ্ঞাপনে ঠাঁই পেত, এখন ঠাঁই হয় না। পরিবর্তন কিছুই হয়নি এমন নয়, বেশ ভালো রকম পরিবর্তন হয়েছে।

তবে কী ওরা কিছুই শেখে না এমন ক্ষোভ নিতান্ত অমূলক? অন্তত পরিমাণের বিচারে দেশ অনেক এগিয়েছে একথা মানতেই হবে। আর গুণগত মান? প্রশ্নতো মূলত তাই নিয়েই। দেশে অনেক এঞ্জিনিয়ার হয়েছে, অনেক ডাক্তার হয়েছে, অতীতে যে দেশ এমনকি সূচ কিনতেও বিলেতের বাজারে ছুটত সে দেশে এখন ভারী শিল্প তার গর্বের বিষয়।

গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের মতো চিন্তাবিদ সব দেশে সব কালেই বিরল, কেন বিরল তাই নিয়ে আলোচনা বৃথা। জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্রের মতো বা রাধাকৃষ্ণাণ-কৃষ্ণমূর্তির মতো প্রতিভাতো পাশের বাড়িতে মেলে না। এই সত্য মেনে আলোচনা করতে হয়। আমরা কেবল বিজ্ঞানশিক্ষার কথাই বলব।

(২)

গত ১০-১২-২০১৫ মৌলানা আজাদ কলেজ আয়োজিত একটি আলোচনা চক্রে উপস্থিত হবার সুযোগ হয়েছিল যেখানে আলোচনায় ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গবেষকরা। আলোচ্য বিষয় ছিলঃ মেটিরিয়ালস সাইন্স। সেখানে যে কথাগুলি বলেছি তা সামান্য বদলে বা মেরামত করে নিয়ে এখানেও বলতে পারি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আমাদের গবেষক-বিজ্ঞানীরা কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। কিন্তু, বিজ্ঞানপাঠ ও বিজ্ঞান গবেষণা সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ধরা যাক কৃষি ও সেচের বিষয়। কৃষিতে উৎপাদন বাড়াতে হবে, বাড়াতেই হবে। আমাদের গবেষকরা অনেক খেটেখুটে সবুজ বিপ্লবের রূপরেখা বানিয়েছেন। গোড়ায় উৎপাদন নিশ্চয় বেড়েছে। কিন্তু, তারপর আমরা দেখেছি ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে গেছে, কীটনাশক ঢুকে পড়েছে খাদ্যশৃঙ্খলে। বৈচিত্র হারিয়েছে, কত যে প্রজাতির শস্য উধাও হয়েছে তাও বলা শক্ত। আমাদের ছোটবেলায় খালে-বিলে যেসব মাছ পাওয়া যেত বর্ষাকালে, সেসব আর মেলে না। বন্যা ও খরা এখন নিয়মিত অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়।

বন্যার কথায় মনে পড়ে কেদারদার কথাগুলি। তিনি বলেছিলেন, এককালে বন্যা নিয়মিত ব্যবধানে দেখা দিত। আমরা আতঙ্কিত হয়েছি যদি আজ, তো কাল খুশিতে মেতেছি। কারণ, বন্যার জল বয়ে আনত টন টন পলি, যা জমির উর্বরতা বাড়িয়ে দিত বহুগুণ। এখন বাঁধ বাঁচাতে জল ছাড়লে বন্যা হয়, বন্যা আসে নিষ্ঠুর বার্তা নিয়ে, বালিতে জমি ঢাকে।

এই রাজ্যের প্রায় তিরিশ শতাংশ বা তারও বেশি ব্লকের জলে আর্সেনিক বা ফ্লুওরাইড।

এখন সেইসব গবেষক-বিজ্ঞানীরা মানছেন যে পরিকল্পনায় ভুল ছিল। মানছেন না যে ভাবনা বা দর্শনেই ভুল ছিল, তাই তাঁরা দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের গান বাঁধছেন। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে-তাঁরা সমাজের এই চাহিদাটাই মাথায় রাখছেন, যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন না পরিবেশ বা বাস্তুতন্ত্রের কথা যার বিপর্যয়ে মানবসভ্যতাই ধ্বংস হবে। ভাবছেন না যে প্রথম সবুজ বিপ্লব যদি ভূগর্ভস্থ জলের ক্ষতি করে থাকে তবে দ্বিতীয়টির কারণে কী কী ক্ষতি হতে পারে। নদীগুলি ধ্বংস হবে নাতো, ঋতুচক্রে আঘাত আসবে নাতো, হারাবে নাতো জীববৈচিত্র?

(৩)

পদার্থবিজ্ঞানের সরল এক সূত্র বলে, পীড়ণ বাড়ালে সমানুপাতে বিকৃতি বাড়ে, কিন্তু তার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে যা পার হলে পীড়ণ ও বিকৃতির সম্পর্ক আর সরলরৈখিক থাকে না এবং নির্দিষ্ট সীমা পার হলে পীড়ণ কমালেও বস্তু আর পূর্বাবস্থায় ফিরতে পারে না। প্রকৃতির ওপর পীড়ণ বাড়ালেও একই ঘটনা ঘটে। প্রকৃতি কিছু অত্যাচার বা পীড়ণ সহ্য করে কিন্তু সীমা ছাড়ালে তার প্রতিক্রিয়ায় প্রকৃতির প্রতিবাদ হয়ে ওঠে ভয়ংকর, খরা-বন্যা ইত্যাদি তারই বহিঃপ্রকাশ।

একালের শিক্ষা সমাজ বা রাষ্ট্রের চাহিদায় লাগাম পরাতে সাহায্য করেনা। প্রশ্ন হতে পারে-লাগাম কী পরানো সম্ভব? একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বিদ্যুৎশক্তি সকলেরই নিত্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু তার ঘাটতি আছে। ঘাটতি মেটাতে রাষ্ট্র জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে গুরুত্ব দিল। মন্দাকিনী নদীর ওপর এমন এক প্রকল্পে কর্মরত এক এঞ্জিনিয়ার আমাকে দুঃখ করে বললেন, আর তো এখানে বেশিদিন থাকতে পারব না—এমন সুন্দর পাহাড়-জঙ্গল-নদীতীর ছেড়ে যেতে হবে।

– কেন?

– লোকে আপত্তি জানাচ্ছে, বলছে ঢের হয়েছে, আর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তারা এই অঞ্চলে বানাতে দেবে না। আমাদের কাজ যাবে সেটা বড় কথা না, অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকেদের দাবি মানতে উন্নয়নের কাজ বন্ধ হতে চলেছে, হাজার হাজার মানুষ কাজ হারাতে চলেছে, বিদ্যুতের দাবি মিটবে না। অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকগুলো নিজেদের ক্ষতি কিসে তাও বোঝে না।

এঞ্জিনিয়র ভদ্রলোক তো ভুল কথা বলেননি। কিন্তু তিনি যা বুঝতে চাননি, তা হলো-তাঁদের উন্নয়নের নক্সা বাস্তবায়িত হলে নদী তার প্রাণ হারাবে, জঙ্গল মুছে যাবে, পাহাড় ভাঙ্গবে। যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে আনন্দ দিচ্ছে সেই সৌন্দর্য তিনি আর প্রত্যক্ষ করতে পারবেন না। জানিনা কেদারতীর্থের ভয়ংকর পরিণতি তিনি দেখেছেন বা শুনেছেন কিনা।

মন্দাকিনীর পাশে ছোট্ট সুন্দর যে রম্ভারা গ্রাম আমাদের মুগ্ধ করেছিল তা আজ আর নেই, প্রকৃতির নির্মম আঘাতে তা নিশ্চিহ্ন। তিনি কী বুঝতে পারছেন যে অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকগুলো প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিয়েছে তারাই প্রকৃত শিক্ষিত।

তা হলে? নদী বেঁধে জলবিদ্যুৎ কোন সমাধান নয়? বিকল্প কী? পরমাণু বিদ্যুৎ? অনেকে তা নিয়ে উৎসাহ দেখাচ্ছেন, রাশিয়া-জাপানের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটার পরেও! অথচ আমরা জানি, কেবল বন্টন ব্যবস্থার ত্রুটিতে আর সংবহনের জটিলতায় উৎপন্ন বিদ্যুতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অপচয় হয় এবং সেই অপচয় রুখতে পারলেই অন্তত এখনকার মতো মানুষের চাহিদা মেটানো যায়! গবেষণা কেন সেই পথ খুঁজছে না? একেবারেই সে পথে কেউ নেই এমন নয়, কিন্তু উদ্যোগ যথেষ্ট নয় বলেই আমার ধারণা। নবীন গবেষকদের আমার আশঙ্কা, আমার ধারণার কথাই বলেছি। আমি চাইছি গবেষকরা ভাবুন, 'প্লাস্টিক'-এর মতো সর্বনেশে দূষণের কথা। সমাজ ও রাষ্ট্রকে সে সমস্যা বুঝতে সাহায্য করুন।

মানুষ ন্যায্য কারণেই যেমন নদী-বাঁধে তেমন পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পে, নিয়মগিরিতে বাধা দিয়েছে, প্রকৃতির লাঞ্ছনা তারা আর সমর্থন করতে পারছে না। তারা যে খুব শিক্ষিত মানুষ, দীক্ষিত মানুষ এমন না। অনেকেই তারা নিরক্ষর, কিন্তু তারা জীবন দিয়ে, অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছেন সমস্যাটা। তারা নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে, চীপকো আন্দোলনে যোগ দেয় প্রাণের টানে, তাদের সহায় তাদের সংস্কৃতি। তারা নদী-পাহাড়-জঙ্গল রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা পেয়েছে তাদের সংস্কৃতি থেকে। একালের শিক্ষাব্যবস্থা সেই সংস্কৃতি মুছে দিতে উদ্যত, একালের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের বোধ থেকে মানবতার আদর্শ মুছে ফেলতে চায়, ত্যাগ তিতিক্ষার পথ থেকে সরিয়ে আমাদের অভ্যাসে-মননে ভোগ-বিলাসের মোহ বিস্তার করতে চায়-এই সবই আমাদের সংস্কৃতিবিরোধী।

(৪)

অভী দত্ত মজুমদারের উদ্যোগে হল পরিবেশ ২০০৯। সেই সময় আলাপ হয় মণিদার সাথে। তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচয়ও সেই সময়। পরিবেশ দূষণ নিয়ে তাঁর উদ্বেগ ছিল, দূষণরোধে উদ্যোগ ছিল। তাই তিনি আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

ভারি অদ্ভুত মনে হয়েছিল মানুষটিকে। একেবারে সাদামাটা মানুষ, ভীড়ে হারিয়ে যাবার মতো পোশাক, ভীড়ে মিশে যাবার মতো বাচনভঙ্গি। মুখোমুখি বসে তিনি খুব কথা বলেছেন এমন না, কিন্তু টেলিফোন করতেন অনেক কথা বলার জন্য। সেসবই কেজো কথা-তাঁর ভাবনার কথা। বয়স যত বেড়েছে ততই যেন শিক্ষা-সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর উদ্বেগ বেড়েছে।

আমাদের সংস্কৃতি একালের শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। একালের খাদ্য-পোশাক-ধর্ম-রাজনীতি নিশ্চিতভাবে আমাদের ঐতিহ্য থেকে সরে যাচ্ছে, কোথাও তার ফল শুভ হচ্ছে নিশ্চয়, কিন্তু সার্বিক বিচারে চাপ বাড়ছে সংস্কৃতির ওপর। বিকৃত হচ্ছে সংস্কৃতি।

মণিদার একটি বই-এর মুখবন্ধে (বাংলায় আর্সেনিক, প্রকৃতি ও প্রতিকার) মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন, 'সমস্যাটি (আর্সেনিক দূষণ) খুবই ভয়াল, সত্যই এটা "সভ্যতার সংকট"। দূষণের ব্যাপ্তি বিচার করে, সমাজ দূষণ বিবেচনায় রেখে বলতে চাই যে এটা একই সঙ্গে "শিক্ষা-সংস্কৃতির সংকট"। এই সংকট থেকে, এই বিচ্ছিন্নতা থেকে একালের যুবসমাজ মুক্ত হোক এমনটাই তিনি চাইতেন, কিন্তু তার জন্য কাজ যা করার তা করতে চাইতেন নীরবে, আড়ালে দাঁড়িয়ে। বিজ্ঞানচর্চায় মাতৃভাষার গুরুত্ব বা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শ প্রচারে মণিদা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের আদর্শ আছে কিন্তু আমাদের প্রেরণা মণিদা আজ আর নেই।।

মনীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার-আমার দেখা এক সমাজ বিজ্ঞানী

ড: অরুনকান্তি

(arun_kanti@yahoo.co.in)

২০০৯/১০ সালের এক উত্তাল সময়ে পরিবর্তনের আশায় যখন রাস্তায় হাঁটছিলাম টমাস, ফামা, ফ্রেন্ডস অফ ডেমোক্র্যাসীর মতো কয়েকটা গনসংগঠনের সাথে, তখনই পরিচয় হয়েছিল মনিদার সাথে। পরিচয়ের পর ভালো লেগে গিয়েছিলো এই সরল মানুষটাকে তাঁর সহজতার জন্য। মনিদা প্রায় প্রতিটি মিটিং-এ শুধু আসতেন না, সিদ্ধান্ত নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও নিতেন। দেখেছি কত কষ্ট করে কল্যানীর বাড়িতে রাতের ট্রেনে ফিরে যেতেন, যেখানে অনেককে দেখেছি মিটিং-এ উপস্থিতি জানিয়ে চলে যেতে। ভীষণভাবে যেকোন বিষয়কে গুরুত্ব দিতেন-এটাই মনিদা। সমাজ সচেতন মনিদা গভীরভাবে যেকোন বিষয়কে বিশ্লেষণ করে শেষতক পৌছনোর চেষ্টায় অবিরতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের পরিবেশ বিভাগের একটি কাজে ড: দেবব্রত ঘোষের সাথে গিয়েছিলাম বিহারের ভাগলপুর অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামে, উদ্দেশ্য ফ্লুরাইডে আক্রান্ত মানুষদের অবস্থা পর্যালোচনা করা, যে জলের জন্য অধিবাসীদের এই দুরবস্থা তা দূরীভূত করার জন্য সরকার যে জলপরিশোধনের (ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) ব্যবস্থা করেছিলেন তা কতটা কার্যকরী তা দেখা। ঘটনাচক্রে মনিদা গিয়েছিলেন ভাগলপুর কলেজের একটি কনফারেন্সের মূলবক্তা হিসেবে, উঠেছেন একই হোটেলে। আমাদের সাথে চললেন ফ্লুরাইডে আক্রান্ত মানুষদের অবস্থা দেখতে। অসাধারণ মমত্ববোধ মানুষদের প্রতি। আক্রান্ত মানুষজনদের সাথে আলোচনায় মেতে উঠলেন, তথ্য লিপিবদ্ধ করলেন। যে কাজটাই করতেন তার মধ্যে অনুসন্ধিৎসার প্রাধান্যই বেশির ভাগ সময় থাকতো। জানুয়ারী ২০১১ সালে মনিদার লেখা 'ফ্লোরাইড বিষণ' নামে একটা তথ্যমূলক বই 'দিশা' বার করলো। আমার সংগ্রহশালায় মনীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ও রবীন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত 'পরিবেশবিদ্যা পরিচয়' ও মনীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার রচিত 'পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যে-আর্সেনিক ও ফ্লুরাইড', এবং মনীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার রচিত "Low-Level Chemical Pollution Endocrine Disruption and the Imperilled Biosphere" আছে, যা আমার প্রতিমুহূর্তে কাজে লেগে থাকে।

২০১৩ সালে সিউড়ি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে একটি কনফারেন্সে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখা হয়ে গেল মনিদা, রবীনবাবু আরো অনেকের সাথে। কনফারেন্সের শেষদিনে মনিদা বললেন-চলুন সবাই একটা সুন্দর জায়গায়, বাঁকুড়ার ছাতনা অঞ্চলের ফুলবেড়িয়া গ্রামে 'আমাদের হাসপাতালে'। মনিদার বন্ধু ডা: পীযূষকান্তি সরকার ও ওনার স্ত্রী কৃষ্ণা সরকার পরিচালিত 'আমাদের হাসপাতাল', এক মানবিক ও স্বল্পব্যয়ে সঠিক চিকিৎসার হাসপাতাল। আদিবাসী গ্রামে কাজ করে চলেছেন দীর্ঘদিন ধরে প্রায়ই একক প্রচেষ্টাতে, সহমর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন মনিদার মতো কিছু মানুষজন। মনিদা কখনো টিভি দিয়ে, কখনো ল্যাপটপ দিয়ে এবং নানানভাবে সহায়তা দিয়ে হাসপাতালের একজন হয়ে উঠেছিলেন। ২০১৪ সালের ৬ষ্ঠ বর্ষপূর্ত্তি অনুষ্ঠানটি মনিদার সভাপতিত্বে একটি অন্য মাত্রা পেয়েছিলো। ২০১৫ সালের ৭ম বর্ষপূর্ত্তি অনুষ্ঠানে মনিদার মতো সমাজ বিজ্ঞানীকে আমরা আর পাবো না।

মনিদা প্রচুর স্বপ্ন দেখতে জানতেন। তাঁর আরেকটি স্বপ্নের কথা বলবো। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নামে একটি রিসার্চ সেন্টার তৈরী করা এবং যাতে ছেলেমেয়েরা শুধু পড়াশুনো নয়, নিজেরাই রিসার্চে স্বয়ম্ভর হবে ও রিসার্চ সেন্টারে তৈরী কেমিক্যাল প্রোডাক্টস বিক্রী করে জীবন চালাতে পারবে। নিজের কল্যানীর বাড়ীতেই একটা ল্যাব তৈরী করলেন। কাজ শুরু হয়ে গেল। স্বপ্ন পূরণ হবার আগে তাঁকে হঠাৎ চলে যেতে হল। এখন এই সমাজ বিজ্ঞানীকে বাঁচিয়ে রাখতে মনিদার নির্দেশিত পথেই আমাদের পথ চলতে হবে।

বিজ্ঞান আন্দোলন, শিক্ষাব্যবস্থা ও মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

সমীর কুমার সাহা
(sahasamir7@gmail.com)

জানুয়ারী মাসের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগেস বিজ্ঞানের জাতীয় মেলা। কিছুদিন আগেই কলকাতায় এর ১০০ বছর পূর্তি হল। শিক্ষক হিসাবে আমার চল্লিশ বছরের চাকুরী জীবনে যাদবপুরে দু'বার বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। '৮০ বিজ্ঞান কংগ্রেসে সম্পাদক ছিলেন আমাদের গণিতের অধ্যাপক দিলীপকুমার সিন্‌হা (পরবর্তী ১৯৯৫ সালে যৌথভাবে এ কাজ করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু এবং অধ্যাপক আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়)। '৮০ সালে 'প্রদর্শনী উপসমিতির দায়িত্বে ছিলেন রসায়ণের ডঃ সবুজ ভাওয়াল। আর আমি ছিলাম উপসমিতির একজন সদস্য। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' একটি স্টল চান ও অনুমোদিত হয়।

সেই সময় থেকে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র সাথে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়। যারা সামনে ছিলেন, তার মধ্যে অভিজিৎ লাহিড়ী, পার্থ সেন, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় আর রবীন মজুমদার-এর কথাই এখন মনে পড়ছে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের ঐ ষ্টলের পোষ্টার নিয়ে বিতর্ক ওঠে। যাদবপুরে আমরা একটা বিজ্ঞান ক্লাবও তৈরি করতে পেরেছিলাম। বেরোত একটা সাময়িক পত্রিকাও—'বিজ্ঞান'। ছিল অমিত, চিন্ময়, শুভাশীষ, দীপকের মতো ছাত্রেরা।

হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার সময় থেকে 'সায়েন্স টুডে' এবং 'ফ্রন্টিয়ার' এবং তার পরে 'উৎস মানুষ', 'অন্বেষা'—এই সাময়িক পত্রিকাগুলি চিন্তাধারা সমৃদ্ধ করেছিল। মনের মধ্যে কাজ করতো একটা ধারণা—বিজ্ঞান মানুষের জন্য, শুধুমাত্র বিজ্ঞানীর জন্য নয়, জনবিজ্ঞানের একটা আবছা ধারণা মনে তৈরি হচ্ছিল। নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আন্দোলনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সংযুক্তি, বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণ, বাংলায় বিজ্ঞান লেখা—এই সবই ছিল আমাদের কাজ। বিজ্ঞান প্রদর্শনী করাও ছিলো আর একটা প্রচেষ্টা। যাদবপুরের ছাত্রদের সাথে সবাইকে মিলিয়ে কাজ করার চেষ্টায় অভিজিৎ লাহিড়ীর কোলকাতার বাড়িতে মিটিং হয়েছিল বহুকাল আগে।

প্রথম থেকেই 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র আমি নিয়মিত পাঠক। সেটা '৮০-র দশকের শুরু। তখনও 'বিশ্বায়ণ' প্রক্রিয়া শুরু হয় নি।

ইতিমধ্যে শিক্ষকতার প্রায় এক দশক পূর্ণ হোল আমার। বিভাগে ও অন্যত্রে—শিক্ষকদের কোন্দল দেখে—তখনই বীতশ্রদ্ধ। পড়া, পড়ানোর থেকে নামডাক, পদোন্নতিই বেশি কাম্য। চেষ্টা করছিলাম— ব্যক্তিগত উদ্যোগে পঠন-পাঠনের উন্নতি করার।

এইসময়েই হাতে এলো—বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর ১৯৮৪ সালের একটি সংখ্যা যাতে অধ্যাপক মণীন্দ্রনারায়ণের লেখা "বিজ্ঞানশিক্ষা ও গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ঃ কি হয়েছে, কি হতে পারতো'। কিছু লেখা আছে-আমূলে জীবনদর্শন পাল্টাতে পারে, এটা সেরকমই একটা লেখা।

ঐ লেখাটির যে কথাগুলো মনে রাখার মতো—

(১) গবেষণা বা গবেষণার জন্য বিদেশ যাওয়া—দেশের লোকের কাজে লাগে না। তবে গবেষণা শিক্ষকদের জ্ঞানচর্চার সহায়ক; করা উচিত। ক্লাসের পাঠ দানকে গুরুত্ব দিয়ে, তার পরে।

(২) গবেষণার কাজে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের জড়ানো উচিত।

(৩) পাঠাগারের ব্যবহার কমে এসেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠাগারমুখী করা উচিত।

(৪) মাস্টারমশাইদের ক্লাসে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত —একটি পাঠ্যপুস্তক প্রথম থেকে শেষ-ভালোভাবে পড়ানো প্রধান কাজ।

(৫) শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার বজায় রাখা উচিত, মতামতে ভেদাভেদ থাকলেও।

(৬) বিদেশী যন্ত্রপাতি কেনার বদলে নিজেদের যন্ত্র তৈরি করার দিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত-তাহলে রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হবে।

(৭) শিক্ষকদের 'সচেতন নাগরিক' হতে হবে।

সমস্ত বক্তব্যগুলোই এখনও সমান সত্যি!!

অধ্যাপক মজুমদারের লেখা পড়ে আমি ওনার ভক্ত হয়ে গেলেও—ওনার সাথে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ২০১৪-র জুন মাসে। বিজ্ঞানশিক্ষার এক আলোচনা সভায়।

বয়স্ক অধ্যাপকের যে প্রাণদীপ্ত চাঞ্চল্য দেখেছিলাম---ভুলতে পারবো না। অধ্যাপক অনিল সদ্‌গোপালের কাছ থেকে কোশাম্বীর বই নিয়ে একটি কপি করে যেন ওনাকে পাঠাই-ছিল ওনার অনুরোধ। বইটি জনবিজ্ঞানের ওপরে।

তারপরে একদিন খবর পেলাম উনি দেহত্যাগ করেছেন।

অধ্যাপক মজুমদার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে যা ভাবতেন, যা বলে গেছেন এবং করে গেছেন-সেটা যদি আমরা শুধু মনে রাখি, সেটা একটা অসম্পূর্ণতা হবে। সত্যি যদি কাজে পরিণত করতে পারি, তবেই উনি যেখানেই থাকুন, খুশী হবেন।

মনে রাখতে হবে—এখন বাংলায় বিজ্ঞানের পত্রিকা প্রায় নেই, বাংলায় ভালো পাঠ্যপুস্তকও নেই বললেই চলে। বড়ো বড়ো অধ্যাপকেরা আরও বেশি বেশি করে বাংলায় লিখুন দয়া করে। বাংলায় বিজ্ঞান ব্রাত্য হয়ে রয়েছে!

এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো উচিত নয় কি? মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, এটাই চেয়েছিলেন।

Mobile : 9836165312
9433431839

Phone : (033) 2688 5575
(033) 2668 5278

EMPERIAN ENTERPRISE

GOVT. CONTRACTORS & ENGINEERS

30/5, ANDUL 1ST BYE LANE, HOWRAH - 711 109

ENLISTED CLASS III R & B

SL. NO. - 321

e-mail : emper_enterprise@rediffmail.com

M. N. MAJUMDAR AS I KNEW HIM

N. P. Chaubey
(issaald@gmail.com)

[প্রফে: এন. পি. চৌবে থাকেন এলাহাবাদে। সেখানেই গড়ে তুলেছেন ইন্ডিয়ান সোস্যাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি (ISSA) এবং পিপলস কাউন্সিল অফ এডুকেশন (PCE)। বিগত চল্লিশ বছর ধরে অনুষ্ঠিত করে চলেছে বাৎসরিক এক আলোচনাসভা-প্রতি বছর চারদিন ধরে ভারতের বিভিন্ন অংশের বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। ভারতে এটি বোধহয় বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের একমাত্র মিলনক্ষেত্র। অধ্যাপক চৌবে'র অক্লান্ত উদ্যোগে এটি একটি চলমান ও ঘটমান প্রতিষ্ঠান, যার অফিসটুকু এলাহাবাদে। মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার অল্প সময়েই অধ্যাপক চৌবের অকৃত্রিম সুহৃদ ও সহযোগী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে চৌবেজী তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠিয়েছেন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর জন্য।]

Koromandal Express from Visakhapatnam arrived at Howrah Station on April 3, 2015 at 2.30 p.m. I waited for Prof. M.N. Majumdar and prof. R. Majumdar for over 20 minutes as the coach in which both of them travelled was far behind. I felt relieved the moment I spotted them walking towards me. We walked together to the taxi booth talking. We parted from there in different taxi for our destination. That was my last face-to-face meeting with Prof. M.N. Majumdar, who was addressed 'Manida' by all of us. I didn't know that it was our last meeting. What keeps on reverberating in my thought is his words at Visakhapatnam Railway Station when I inquired about his coach in the Koromandal train, he told me about sleeper class coach. On my questioning as to why did he buy sleeper class ticket, he said : "I do not want to burden the Indian Academy of Social Sciences and Dr. N. P. Chaubey". Such was Manida.

My friendship with Prof. Majumdar began during the 31st sesseion of Indian Social Science Congress in December, 2007 at SNDT Women's University, Mumbai. Nandigram Peoples' Struggles and Haldia Petro-Chemical Struggles at that time were at its climax. Manida's lecture at the Congress was very stimulating. Despite being a Professor of Chemical Sciences, he was deeply concerned with the wellbeing of our people. This concern of his led to a very strong bond between him and the Indian Academy of Social Sciences. He kept on investigating use and misuse of Chemical Science. His lecture on **Low-Level Chemical Pollution, Endocrine Disruption and the Imperilled Biospher** at 33rd session of Indian Social Science Congress in December 2009 at Hyderabad exploded the myth about harmlessness of low chemicals. What he had discovered on his own and without Karl Marx was astonishing. Contrary to the belief held by common people and our scientists' and the Government's tall claim, low chemicals do cause severe damage to our body and our health. Even the so-called safe water in plastic botttles are not safe. How?

Through the **'Cumulative process'.** Low chemicals accumulate in our body system over time and produce negative effects. This also applies to so-called harmlessness of low radiation. This led him to discover effects of fluoride and arsenic chemical on human body. He travelled different parts of India and studied all available science literature. Result was his book on **'Paribesh OJanaswasthe Arsenic O Fluride'** in Bengali published by NBTC. His discovery of very harmful effects of fluoride and arsenic made him highly worried. He studied late Praful Chandra Ray's works in chemistry again and again and finally he established an Institute at his house using all his savings. He kept on trying to create a new educational system till the last moment. He joined Peoples Council of Education as its founder in order to discover and develop a new democratic and scientific education system. He took keen interest in the growth of Amader Haspatal in Phulberia village of Bankura District established by Prof P. K. Sarkar. Such was the wider and broader social concern of Manida as a scientist and as a human being. Alas, we do not have large number of scientists like him amidst us. Today I miss him badly. I used to talk to him over phone once a fortnight and seek his advice. What, however, is left with us his works and his deeds. Let us cherish him and his deeds and try to walk on the road that he paved.

With best compliments from :

M/s. Modern Sanitation

মণিরত্ন

আশীষ লাহিড়ী
(ashish.lahiri@gmail.com)

মণিদাকে প্রথম দেখি বোধহয় ১৯৮৫/৮৬ সাল নাগাদ। তখন অন্বেষা পত্রিকা বার করতাম। দপ্তর ছিল ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে 'কথাশিল্পে'। সম্পাদক অভিজিৎ লাহিড়ী ও প্রয়াত সিদ্ধার্থ ঘোষ। সেইসময় অন্বেষার কয়েক সংখ্যা জুড়ে মণিদা অনবদ্য এক লেখা লিখেছিলেন। বিষয় মণিরত্নের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্ম। চুনি-পান্না-গোমেদ-পোখরাজ প্রভৃতি যে সমস্ত পাথর জ্যোতিষী গুণে সমৃদ্ধ বলে দাবি করা হয়, তাদের আণবিক সংস্থান ও ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ বিচার করে দেখানো হয়েছিল যে আর পাঁচটা ভৌত পদার্থের তুলনায় ওগুলো আলাদা কিছু নয়। লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূরের জ্যোতিষ্কদের সঙ্গে খোশগল্প চালাবার কোনো ক্ষমতা তাদের নেই। পদার্থবিজ্ঞান আর রসায়নের একই নিয়মকানুন তাদের প্রতিও প্রযোজ্য। কাজেই বিশেষ বিশেষ রত্নের বিশেষ বিশেষ অলৌকিক গুণ থাকার গপ্‌পোটি অলস অকবি-কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। দুঃখের বিষয়, অন্বেষার সেই সংখ্যাগুলি আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। যদি কোনো সহৃদয় ও যত্নবান পাঠকের কাছ থেকে সেগুলো উদ্ধার করে ছাপা যেত, একটা কাজের কাজ হত।

পণ্ডিত মানুষ বলে প্রথম প্রথম খুব একটা কাছে ঘেঁষতাম না। কিন্তু মণিদার স্বভাবগুণে সেটা বেশিদিন সম্ভব হয়নি। নানা বিষয়ে আগ্রহ ছিল তাঁর। গৌরীপ্রসাদ ঘোষের প্রধান সম্পাদকত্বে আমি ও অন্য কয়েকজন এভরিম্যান্‌স বলে একটা ইংরেজি-বাংলা অভিধান লিখেছিলাম, সেটা তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। তা নিয়ে প্রচুর আলাপ করতেন, কী করলে আরো ভালো করা যায়, তার পরামর্শ দিতেন। জে ডি বার্নাল-এর *সায়েন্স ইন হিস্টরি*-র ধারাবাহিক অনুবাদ বেরোত অন্বেষায়, উত্তেজিত ও আনন্দিত হতেন তিনি।

বিজ্ঞানের সামাজিক প্রয়োজনের দিকটি এবং বিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনীয়তার দিকটির ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন তিনি। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র নির্বাচিত সংকলনে 'বিজ্ঞানের ইতিহাসের ভূমিকা' প্রবন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটি চমৎকার প্রকাশিত হয়েছিল: 'বিজ্ঞানের ইতিহাসের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। পদ্ধতি আর ধারাও তার স্বতন্ত্র। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আর কয়েকজন ঐতিহাসিক এক জায়গায় হলেই বিজ্ঞানের ইতিহাস লেখা হতে পারে না। এর জন্য ইতিহাস এবং অর্থনীতির ধারণা থাকা যেমন প্রয়োজন, তেমনি দর্শন আর সমাজবিদ্যাও কিছু জানতে হবে।' এই লক্ষ্য সামনে রেখেই পরিণত জীবনের সুরটি বেঁধে নিয়েছিলেন তিনি। দেশের অর্থনীতি, দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যথার্থ বিজ্ঞানশিক্ষা হতে পারে না। রসায়নশিক্ষার নতুন ধরনের বাস্তবমুখী পদ্ধতি নিয়ে অনেক কিছু ভাবতেন। আবার আর্সেনিক দূষণের মতো এমন একটা ব্যাপক সামাজিক বিপদের বৈজ্ঞনিক দিকটা নিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করতেন। একবার আমেরিকায় তাঁর কন্যাদের কাছ থেকে ফিরে বেশ উত্তেজিতভাবে বললেন, 'লাইব্রেরি ঘেঁটে আর্সেনিক নিয়ে প্রচুর আধুনিক গবেষণার মালমশলা সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছি। এগুলোকে নিয়ে বই লিখছি। কোথাও ছাপানোর ব্যবস্থা করা যায়?' প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্সের সঙ্গে কিছুটা চেনাশোনা ছিল। তাঁরা রাজি হলেন ছাপতে। তখন মণিদার বেশ বয়স হয়েছে। শরীরও খুব ভালো না। কিন্তু কল্যাণী থেকে ছুটে ছুটে আসতেন বই প্রকাশের তদারকির জন্য। আমার সৌভাগ্য, সেকাজে আমি তাঁকে কিছু সঙ্গ দিতে পেরেছিলাম। পরে সে বই তো এন বি টি থেকে প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে, বোধহয় অনুবাদও হয়েছে।

একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলাম। যে-সমাজে শিক্ষক সম্প্রদায়ের প্রায় সবাই নিজেদের অর্থবঞ্চিত মনে

করে হাহুতাশ করেন, অর্থ উপার্জন করার আরো যেসব সুযোগ রয়েছে সেগুলোকে কাজে লাগানোর সপক্ষে 'নিও-লিবারাল' যুক্তিসন্ধান করেন, 'নাল্পে সুখমস্তি'র ঐহিক ব্যাখ্যা দেন, সেই সমাজে মণিদা বলতেন, শিক্ষকতা করে যা উপার্জন করেছি সে অনেক, এই টাকাটা কী করে ঠিকভাবে ব্যয় করা উচিত, সেটাই ভাবনা। নিজের খরচায় কল্যাণীতে ল্যাবরেটরি বানিয়েছিলেন, কেউ যদি সদ্ব্যবহার করে তার আশায়। কেউ করেছেন কিনা জানি না।

দর্শন ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নিয়ে তাঁর ভাবনার বিবর্তন ঘটেছিল। একবার ফোন করে বললেন, 'মার্কস একাই তো যুক্তিশীলতার কথা বলেন নি, রাসেলের লেখায় তো এসব জিনিস বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।' মনে হয় ওঁর এরকম ধারণা হয়েছিল যে ভারতের মার্কসবাদীরা মার্কসীয় দর্শনকে পাশ্চাত্য দর্শনের ধারাবাহিকতার ফসল হিসেবে না দেখে, প্রায় যেন এক একমেবাদ্বিতীয়ম ভুঁইফোড় বলে মনে করেছিলেন। অথচ ঐ ধারাবাহিকতায় না-দেখলে মার্কসকে তো বোঝা যায়ই না, উপরন্তু সমাজের ও বিজ্ঞনের বিবর্তন সম্বন্ধে ভুল সূত্রে গিয়ে পৌঁছতে নয়। এই কথাটা আমার খুব মনে ধরত। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেক দুর্বলতার মধ্যে এটিও একটি। বাস্তবিক, অল্প দু'একজন পণ্ডিত মার্কসবাদীকে বাদ দিলে (যাঁদের মধ্যে ইদানীং সবার আগে মনে আসে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যর নাম) বাঙালি মার্কসবাদীরা—যে কোনো কিসিমের—প্রায় কেউই এ ব্যাপারটা নিয়ে সচেতন নন। ফল যা হবার তাই হয়েছে। মার্কসবাদ সম্বন্ধে, সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে, মানুষের শ্রদ্ধাবোধ চলে গেছে। ফলে একদিকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, অন্যদিকে উত্তরাধুনিক নৈরাজ্য গ্রাস করেছে মানুষের মনকে।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম যে মানুষকে জীবন ও জগত সম্বন্ধে ভুল পথের নিশানা দেয়, যার ফলে তার বিজ্ঞনবোধ সংকুচিত হয়ে পড়ে, এটা যেন উত্তরোত্তর বেশি করে মানছিলেন তিনি। স্বামী বিবেকানন্দর মতো আদর্শবাদী তেজস্বী মানুষের প্রভাব এক সময়ে পরাধীন দেশে বিপ্লবীদের দেশের জন্য আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল এটা যেমন ঠিক, তেমনি যত দিন এগিয়েছে, ততই সাধারণ জনমানসে তাঁর ধর্মীয় ইমেজটাই প্রাধান্য পেয়েছে। তা থেকে এক ধরনের সুবিধাবাদী নীতিবোধের জন্ম নিয়েছে বলে মনে হয়, যা বিশেষ করে আমাদের মতো বহু ধর্ম-সমন্বিত দেশে বেশ সমস্যার সৃষ্টি করে। পরস্পরবিরোধী অজস্র মূল্যবোধকে একই সঙ্গে লালন করবার একটা ভূমি তৈরি করে দিয়েছে তা। পক্ষান্তরে বিদ্যাসাগর মশাই বা অক্ষয়কুমার দত্ত যে-ইহবাদী যুক্তিবাদী মুল্যবোধের কাঠামো তৈরি করবার চেষ্টা করেছিলেন, তাকে বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক সমাজ প্রত্যাখ্যান করেছে। এই বিষয়টা নিয়ে একটা বই লিখেছিলাম। আশ্চর্য হয়ে গেলাম মণিদার ফোন পেয়ে। কিছু কিছু ব্যাপারে সমালোচনা করলেও মোটের ওপর তিনি আমার মূল প্রতিপাদ্যটা সমর্থন করলেন।

জীবনের শেষদিকে অদ্ভুত এক খেয়াল চেপেছিল তাঁর। বিদ্যায়তনিক জগতের বাইরে যাঁরা নিজেদের মতো করে ভাবনাচিন্তা করে কিছু নতুন কথা বলার বা নতুন কাজ করার চেষ্টা করছেন, তাঁদের নিয়ে চর্চা শুরু করেছিলেন। আমার সৌভাগ্য, স্নেহবশে আমাকেও তিনি ঐ বর্গে ফেলেছিলেন। একদিন ফোন করে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আপনার প্রথাগত শিক্ষা তো বি এসসি অব্দি।' বললাম হ্যাঁ। পরের প্রশ্ন 'আপনার মোট বই কটা?' বললাম। বললেন, 'আমি সবকটা কিনব। কয়েকটা আমার কাছে আছে, বাকিগুলো কোথায় পাওয়া যাবে?' আমি অভিভূত হয়ে জিজ্ঞসা করলাম, 'হঠাৎ আমার বইয়ের দরকার পড়ল কেন?' তখন ওঁর ঐ বিদ্যায়তন-বহির্ভূত চিন্তাচর্চার 'প্রোজেক্টে'র কথা বললেন। এই স্নেহ ও সম্মানের কথা আমি কখনো ভুলব না।

ওঁর ব্যক্তিগত স্নেহের ও অনুগ্রহের কয়েকটি নিদর্শন দিয়ে এ লেখা শেষ করব। একবার রানাঘাটে একটা অনুষ্ঠানে, উনি আর আমি দু'জনেই গিয়েছিলাম। কলকাতায় ফেরার পথে রাত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও উনি নাছোড়বান্দার মতো স-সঙ্গী আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন কল্যাণীতে ওঁর বাড়িতে, ওঁর ল্যাবরেটরি দেখাবেন ও চা খাওয়াবেন বলে। আরেকবার বললেন, 'আমেরিকা থেকে মস্তিষ্কক্রিয়া আর মনের ক্রিয়া সম্পর্কে এক অসাধারণ বই

বেরিয়েছে, আপনার জন্য তার একটা বাঁধানো জেরক্স কপি করে রেখেছি। লেক টাউনে জয়া সিনেমার সামনে সন্ধে ছ-টায় যদি আসেন, তাহলে বইটা দিয়ে দেব।' লেক টাউনে ওঁর ছেলের বাড়ি। আমার বাড়ি কালিন্দীতে। সেখান থেকে জায়গাটার দূরত্ব পাঁচ মিনিট। সেইজন্য এই ব্যবস্থা।

ইদানীং ওঁকে বেশ ক্লান্ত লাগত। উৎসাহে খামতি ছিল না, কিন্তু শরীর দিত না। শেষ যেদিন ওঁর সঙ্গে ফোনে কথা হয়, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-রচনাবলীর ভালো সংস্করণ কলকাতায় কোথায় পাওয়া যাবে, জানতে চেয়েছিলেন। উনি আমেরিকায় যাবেন, সঙ্গী হবেন রবীন্দ্রনাথ। আমি বিশ্বভারতীর কলকাতা অফিসে খোঁজ নিতে বলেছিলাম। সে-সুযোগ আর পাননি। তার আগেই সব শেষ।

আজ এইটা ভেবে কষ্ট হয় যে নিজের কাজের ব্যস্ততার জন্য মণিদার অনেক অনুরোধ রাখতে পারিনি। মাঝে মাঝে কিছু লেখার খসড়া পাঠিয়ে মতামত চাইতেন। কাজের চাপে কখনো কখনো ভুলে যেতাম। কোনোদিন অনুযোগ করেননি। উলটে অতিরিক্ত চাপ না নেবার পরামর্শ দিতেন।

বিজ্ঞনের সঙ্গে মানুষের অন্যান্য চর্চার, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের বিচ্ছেদ নিয়ে অনেক কথা শোনা যায়। এই বিচ্ছিন্নতার এক মূর্ত প্রতিবাদ ছিলেন মণিদা। পূর্ণাত্মক সমগ্রতার, হোলিজমের প্রবক্তা এই মানুষটির প্রয়াণ পশ্চিমবঙ্গের, হয়তো ভারতেরও, বিজ্ঞান আন্দোলনকে অনেকটাই রিক্ত করে দিয়ে গেল।

সাহিত্য সমাজ বিজ্ঞান সাময়িকী

কালধ্বনি

যোগাযোগ 2/1A আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা

ইমেল : kalodhvani@yahoo.co.in, M : 9830227186

মণিদা বেঁচে থাকবেন আমাদের হৃদয়ে

কুমারেশ মিত্র
(qumaresmitra@gmail.com)

২০১৩ সালের গ্রীষ্মে আসন্ন দুপুরে কল্যাণীর ট্রেনে বসে আছি। উত্তর বাংলার বন্ধুর অসুস্থ পুত্রের জন্য ইলেক্ট্রনিক্সে এম্ টেকের একটা ফর্ম নিতে হবে, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। মণিদাকে বিরক্ত করব না করব না ভেবে ফোন করা হয় নি। তবু শিয়ালদহ চত্বরের মধ্যে অচল ট্রেন আমার দোলায়মান মনের লাগামে টান পড়ল—আমি আমার পকেটস্থ মোবাইল বার করে চালু করে দিলাম, "মণিদা....। ট্রেন ছুটছে তখনও এক ঘন্টা হয় নি, তবে নৈহাটি পেরিয়ে গিয়েছি, ওপার থেকে মোবাইলে জলদ্‌গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল—"তুমি কল্যাণী স্টেশনে নেমে সোজা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী গিয়ে অ্যাসিট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান স্বপন মিত্রর সাথে দেখা করবে; উনি তোমাকে এম টেকের ফর্ম দিয়ে দেবেন, প্রয়োজনে আমার বাড়ির ছেলে সমরের সঙ্গে দেখা করতে পারো ওখানে। লাইব্রেরী পৌঁছে স্বপনবাবুর... সাথে দেখা হলে উনি ছুটলেন ইলেক্ট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টে, অচিরেই ফর্মটা পেয়ে গেলাম। উনি নিয়ে গেলেন কয়েক জন বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীর-কাছে, আমি ফরম্ পেলাম। দরকারি নিয়ম কানুন সব জেনে গেলাম। কত অনায়াসে। এরপর তপ্ত দুপুরে সর্বোচ্চ উষ্ণতার সময়ে একটা ভ্যান্ রিক্সা ভাড়া করে রওনা হলাম মণিদার বাড়ি। বিকেল হয়নি তখনও, মণিদা দাঁড়িয়ে আছেন অনেকক্ষণ বাড়ির সমানে। ঘরে ঢুকতে ঢুকেত বিকেল চারটে। কৃষ্ণা বৌদি তখনও না খেয়ে বসে আছেন আমারই জন্যে। খেতে খেতে কত কথা। পুরোনো কথা, গৌরীর বিয়ের কথা, যেখানে আমাদের কবিতা আবৃত্তির কথা। সৌমেন ছিল সেই দলে এবং গানে। মণিদার কথায় নিবিড় ভালোবাসার টান, আমি কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। এর আগেও এসেছি এ বাড়ি, উনি গিয়েছেন ঢাকুরিয়ায় আমাদের বাসায়। তবে এদিনটা ছিল অনন্য।

পরে ওপর তলায় ওঁর এ-সি ঘরে উনি নিজে হাতে আমার বিছানা বিছিয়ে দিলেন। যেন মায়ের স্নেহে। কনিষ্ঠ পুত্র সৌরভ ও সমর এসে দেখা করে গেল। কথা হল, মণিদার সাথে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হওয়ার পরে উনি প্রায় নির্দেশের সুরে বললেন, এক ঘন্টা ঘুমিয়ে নাও। সন্ধ্যায় চা ও জলখাবার খেয়ে এবং রাস্তায় যেতে যেতে পুরোনো দিনের অনেক কথা, আমাদের চেনা, অচেনা বন্ধুদের কথা তাদের আত্মত্যাগের কথা কি সম্ভ্রম সহকারে বলছিলেন যে আমি শিহরিত না হয়ে পারছিলাম না। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। এর আগে অনেকবার বলেছেন, শিক্ষা সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে আমাদের দুজন বিশিষ্ট বন্ধু যদি ওঁর লেখা ও তার নির্দেশক দিক নিয়ে সমালোচনা করে দেয় তবে উনি কত উপকৃত হন, সেদিনও সে সব কথার অণুরণনে ভাবনায় দেখতে পাই, নম্রতা ওঁর অন্তরে চির্ চির্ করে জ্বলছে, হাঁটা শেষ হলে মেন্ রাস্তার কাঁচরাপাড়া মুখী বাসে তুলে দিলেন, আমি হাত নাড়লাম। আর মনে পড়ল দুপুরের ভাবনাটার কথা— আমার 'উল্টো পাল্টা' চিন্তা ও লেখার জন্যে মণিদা কতটা বকাবকি করতে পারেন। দুপুরের এই আশঙ্কা সম্ভ্রমের হাওয়ায় মেঘের মত উড়ে গেল। এই পণ্ডিত মানুষটি ছোটদেরও কিরকম সম্ভ্রম করেন তা ভাবা যায় না, মানাও যায় না, এবং হয় তো অনেকের জানাও নেই। পরিণত বয়সে তাঁর নিজের মূল্যবান লেখা প্রকাশনার আগে হয়ত আরও অনেকের মত আমাকেও ইন্টারনেটে পাঠিয়েছেন অনেক দিন। এমন কি আমার পারিবারিক ব্যাপারেও তাঁর গভীর কার্যকরী উপদেশ আমাকে সাহায্য করেছে।

এরপর চলে যাই আরও এক পুরোনো ঘটনায়,

২০০৯ সালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট্ হলে উন্নয়ন ও পরিবেশ নিয়ে আলোচনা চক্রের স্মারক সংখ্যা "পরিবেশ ২০০৯" প্রকাশনায়। এর শেষ প্রবন্ধটা ছিল মণিদার লেখা "আবহ পরিবর্তন : আসন্ন সংকটের স্বরূপ সন্ধানে"। বইয়ের পাতার মাপে মাত্র ১১ পৃষ্ঠার প্রবন্ধে অসংখ্য মূল্যবান তথ্যের সমহার ঘটিয়ে পৃথিবীর রাজনীতি অর্থনীতি, সমাজ জীবনের ইতিহাস এবং মানুষের সৃজনশীল কর্ম-কাণ্ডের সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের একটা সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করেছেন এবং এভাবে সভ্যতার নানা স্তর ছুঁয়ে গিয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তনে পৃথিবীর আসন্ন সংকটের একটা ভীতি-প্রদ ছবিও এঁকেছেন। এই আতঙ্কের দিকটা বাদ দিলে বলতে পারি এই প্রবন্ধটি পড়ে আমি যার পর নাই মুগ্ধ হয়েছিলাম পাণ্ডিত্যের প্রভায়। আজও সময়ের মাপকাঠিতে আবহাওয়া পরিবর্তন নিয়ে কিছু লেখার/বলার আগে এই প্রবন্ধটা আমি অনেক সময় দেখে নিই।

যতদূর মনে পড়ে ২০০৯-এর মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে মণিদার টেলিফোন এল-লেখাটা পড়েছ? কিরকম লাগল?....আমি উত্তর করলাম-খুব ভালো লেগেছে, ভীষণ ভালো লেগেছে। তবে একটা বিষয়ে আমার ধারণা একটু আলাদা-পরে তা চিঠি লিখে জানাচ্ছি। আর সমগ্র বিষয়টি আপনি যদি চারটে পৃথক প্রবন্ধে লিখতেন, তবে আমাদের খুব উপকার হত। মণিদা সঙ্গে সঙ্গেই এই শেষের বিষয়টায় এক মত হলেন। মণিদার সংক্ষিপ্ত লেখায় আমার কাছে আতঙ্কের বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল "গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, ইয়ানসি, পীত, মেকং, সালউইন প্রভৃতি নদীগুলি ২০৩৫ সালের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে। গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বর্ষণ যদি থাকেই, তবে তা দিয়ে চমক বন্যা বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভাসিয়ে আঞ্চলিক সমাজ ও অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করবেই।"....আমি এত দ্রুত আসন্ন বিপদের ছবি মন থেকে গ্রহণ করতে পারলাম না। আমি আমার বোধ, চিন্তা ও স্বল্প জ্ঞানের উপর ভর করে পাতা জুড়ে উত্তর পাঠালাম মণিদাকে। সে চিঠিতে আরও ছিল সব অন্য কথা-সমাজ, বিজ্ঞান ও পরিবেশ নিয়ে আন্দোলনরত কর্মীদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের জানা উদাহরণ। বেশ কিছুদিন পরে বুঝতে পেরেছি, মণিদা আমার লেখাটা একদম ভালো মনে নিতে পারেন নি। বরং তিনি এতই কুপিত হয়েছিলেন যে যতদূর বুঝতে পেরেছি, মণিদা আমার বি-ও-বির প্রায় সব বন্ধুকেই টেলিফোন করে তাঁর উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। হয়ত আমার লেখার মধ্যে ছড়ানো কোনো উগ্রতা ছিল যা আমি সেদিন বুঝতে পারি নি। অথচ সাক্ষাতে মণিদা আমাকে কিছুই বললেন না, শুধু স্বরে কিছুটা গাম্ভীর্য ছিল-তা কতটা আমার সাইকোলজিক্যাল্ কতটা বা রিয়্যাল্ সেটা এখন মাপা মুশকিল। প্রসঙ্গত: ২০০৭ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তৈরী ইন্টারগভার্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট্ চেঞ্জ (আই পি সি সি) আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কীয় তার চতুর্থ প্রতিবেদনে লিখেছিল, ২০৩৫ সালের মধ্যে হিমালয়ের গ্লেসিয়ার সব গলে জল হয়ে যাবে। এর প্রতিফলন ছিল তখন সদ্য প্রকাশিত ভূ-উষ্ণায়ন নিয়ে লেখা কিছু জনপ্রিয় ইংরাজি বইয়ের পাতায়, যতদূর জানি মণিদার এরকম বই পড়া ছিল, আমি একদমই পড়ি নি, তবে এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে একদল বিজ্ঞানীর সংশয় ছিল এবং তাঁরা কিছুটা সোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। পরে আই. পি. সি. সিও ভুল স্বীকার করে নেয়। অনেককে অবাক করে জানায় হিমালয়ের সব বরফ গলে যাওয়ার সময় ২০৩৫ নয় ২৩৫০ সাল— সবটাই ছাপার ভুল!

উপরে উল্লেখিত প্রবন্ধে ২০০৯ সালেই মণিদা লিখেছিলেন, "বর্তমান ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে চলেছে অভূতপূর্ব জন-আন্দোলন, উগ্রপন্থাও। স্বতস্ফূর্ত, অনিয়ন্ত্রিত। কেন?.... এসবের সাথে ক্লাইমেট্ পরিবর্তনের আপাত কোন সম্পর্ক চোখে পড়ছে না। কিন্তু ক্লাইমেট্ অদৃশ্য দূর-নিয়ন্ত্রক, রিমোট্ কন্ট্রোলার্" এটা পড়ে আমি এতটাই থমমত খেয়ে গিয়েছিলাম যে চিঠিতে এসব নিয়ে লেখার আর উৎসাহ পাইনি। পরে দেখছি এই ২০০৯ সালেই একজন বিদেশী গবেষক ক্রিশ্চিয়ান প্যারেন্টি ভারতে আসেন উগ্রপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে ক্লাইমেন্ট চেঞ্জের সম্পর্ক অন্বেষণে, হিংস্র আন্দোলন ও বৃষ্টি পাতের মানচিত্রের মধ্যে তুলনা করে তিনি দেখেছেন যেখানেই খরার প্রসার ঘটেছে, সেখানেই মাওবাদীরা

এগিয়ে গিয়েছে। তথাকথিত লাল বারান্দা (red corridor) যা ইস্টার্ন ঘাটের পাশ দিয়ে বিহার এবং প:বঙ্গ থেকে উড়িষ্যা ও ছত্রিশগড়ের মধ্যে দিয়ে অন্ধ্র প্রদেশ ও আরও দক্ষিণ ও পশ্চিমে প্রসারিত, তা আবার খরারই বারান্দা (draught corridor)। অন্ধ্র প্রদেশ ও সংলগ্ন অঞ্চলে ১৯৮৪-'৮৫, ১৯৮৬-'৮৭, ১৯৯৭-'৯৮, ১৯৯৯-২০০০ এবং ২০০২-২০০৩ সালে তীব্র খরার সৃষ্টি হয়। আবার এই বছরগুলিই ছিল ওখানে 'নক্শাল-পন্থী' আন্দোলনের উত্থানের বছর। তবে শুধু খরা নয়, মুক্ত বাজারের সরকারি নীতিও মাওবাদী আন্দোলনে ইন্ধন যোগায়। (Farmer suicides, Naxal Violence linked to Climate change-by christian Parenti, TIMES OF INDIA, KOLKATA, December 2, 2015)। এসবতো মণিদারই কথাঃ ক্লাইমেট্ অদৃশ্য দূর নিয়ন্ত্রক, রিমোট্ কন্ট্রোলার। মণিদা জল, মাটি, সমাজ, শিক্ষা, পরিবেশ নিয়ে অনেক চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন সমাজ ও বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী ও সাধারণ মানুষের জন্য। তাঁর লেখা বই 'বাংলায় আর্সেনিক' এবং 'পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যে আর্সেনিক ও ফ্লুরাইড' শুধু পণ্ডিতী উৎকর্ষের নিদর্শন নয়, তিনি সত্তরোর্দ্ধ বয়সেও পশ্চিম বাংলার দূরতম প্রান্তে গিয়েও সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন। বিখ্যাত পরিবেশবিদ্ তারকমোহন দাস তাঁর আর্সেনিক বইটি দৈনিক স্টেট্স্ম্যান পত্রিকায় রিভিউ করার সময় লিখেছিলেন, যদি দুই বাংলার এক ডজন সেরা বই নির্বাচন করতে হয়, তবে মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের এই বইটি তার মধ্যে থাকবে।

বই পড়া তার নেশা হলেও তিনি কেতাবি পণ্ডিত ছিলেন না; সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন একজন সমাজ বিজ্ঞানী-শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ আন্দোলনে নিমগ্ন এক সন্ন্যাসী। বই, কাজ, চিন্তা ও অসংখ্য গুণগ্রহীর সঙ্গে আন্ত:ক্রিয়ায় সৃষ্টির যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হয়ে থাকতেন, ফসল ফলত তাঁর লেখায়। জ্ঞানের অন্বেষণে যন্ত্রণায় তিনি বি-ও-বি ও বি-ও-বির বাইরে অনেক গুণী মানুষের কাছে ছুটে গিয়েছেন দিনের পর দিন, বয়সে অনেকেই ছিল তাঁর চেয়ে ছোট। শরীরে যন্ত্রণা নিয়ে দীর্ঘ লড়াই সেরে জয়োন্মুখ এই মানুষটির জীবনদীপ আকস্মিকভাবে নিভে গেলেও, বি-ও-বি ও সায়েন্টিফিক্ ওয়ার্কাস ফোরামের পুরোধা সাধক মণিদা বেঁচে থাকবেন আমাদের হৃদয়ে।

বইমেলায় বি-ও-বি

2016 এর 40 তম কলকাতা পুস্তক মেলার আসর আবার মিলন মেলায়
এই মেলায় থাকছে বি-ও-বি, যথারীতি ছোট্ট টেবিল স্পেস-এ।
উদ্দেশ্য কাঙ্খিত-জন অথবা হারিয়ে যাওয়া-হারাতে বসা কিংবা
হঠাৎ হয়ে যাওয়া বন্ধুদের সঙ্গে নতুন করে চেনাচিনিটুকু।
এইই তো বি-ও-বি-র পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা.....।
টেবিল নং 163

মণিদাকে মনে করে

সুভাষচন্দ্র গাঙ্গুলী
(subhasganguly@gmail.com)

তাঁর পরিচিত জনেদের অধিকাংশের কাছে উষ্ণ ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র এক বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু, সারা জীবন ধরে জনস্বার্থের সাথে নানাভাবে যুক্ত ও প্রাণোচ্ছল মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, আমাদের মত অনেকের কাছে 'মণীদা', যে আর নেই সেটা যেন এখনও ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। ৭ই জুন, রবিবার '১৫, বিকেলে কল্যানীতে তাঁর নিজ বাসভবনে থাকা অবস্থায় আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। পেশাদারী প্রয়োজনে তাঁর সন্তানরা (এক কন্যা ও দুই পুত্র) দূরে দূরে থাকায় শেষ সময়ে শুধু বৌদি (কৃষ্ণা মজুমদার) তাঁর পাশে ছিলেন। এই নীরব করেদেওয়া খবর পাবার সাথে সাথে কাছে দূরে আমরা অনেকেই তাঁকে শেষ দেখার ও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ছুটে গেছি। আরও অনেকে পরের দিন দাহ স্থানে শোকর্তহৃদয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

বেশী বয়েসে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে তার কিছু কিছু তাঁর ক্ষেত্রে আগাম দেখা দিয়েছিল এবং থেকে থেকে ও ক্রমশ বেশী মাত্রায় প্রয়োজনীয় শারীরিক কর্মকান্ড-সংক্রান্ত নানা গোলযোগ থেকে তিনি বেশ কিছু দিন ধরেই ভুগছিলেন। সে সময় যাদের সাথে তাঁর দেখা সাক্ষাত হয়েছে তারা অনেকে সময় সময় একটু-আধটু আশঙ্কিত বোধ করে থাকলেও সেই আশংকা নিশ্চয় দূরে ঠেলে দিয়ে থাকবেন। কিন্তু তিনি নিজে যেন অনেক দিন ধরেই তাঁর বিদায়ের আগাম বার্তা পাচ্ছিলেন। যেমন শেষ যাত্রার কয়েক মাস আগে এক বয়োঃকনিষ্ঠ বন্ধুকে তিনি ফোনে এমন কথাও বলেছেন যে তাঁর আয়ুষ্কালের আর অল্পই বাকি আছে। আরও আগে তাঁর আর এক বয়োঃকনিষ্ঠ বন্ধুকে—যে তার আগে হঠাৎ খেয়াল বশত নিজের করা কিছু কিছু অনুবাদ মণীদা সহ আরো কিছু কিছু বন্ধুদের সাথে অনেক সময় ভাগ করে নিয়েছে—দিয়ে ফোনে বলে রবীন্দ্রনাথের একটি গান অনুবাদ করিয়ে নেন। গানটি' শুরু এই ভাবে ঃ

এই কথাটি মনে রেখো তোমাদের এই হাসি খেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়

ই-মেইলের মাধ্যমে অনুবাদটি তাঁর কাছে পৌঁছালে, যেন হঠাৎ অবাক করে দেওয়ার মত করে ওই গানটি ও আরও একটি সমধর্মী গানের নিজের করা অনুবাদ সেই বয়োঃকনিষ্ঠ বন্ধুকে ই-মেইলে পাঠিয়ে দেন। অন্য গানটির প্রথম কলি ঃ

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে

কেবল এই ধরণের রবীন্দ্রসঙ্গীত বেছে নেওয়ার মধ্যে যে বেদনা-বিধুর মানসিক অবস্থা প্রতিফলিত হচ্ছে তা বোধ হয় নজর এড়ান'র মত নয়।

এই সব মিলে তাঁর চলে যাওয়াটা হয় তো তাঁর ঘনিষ্ঠ জনেদের অনেকের কাছে একেবারে আশংকার বাইরে ছিল না। কিন্তু সেজন্য পরিবার এবং অন্য ঘনিষ্ঠ জনেদের উপর হঠাৎ নেমে আসা বেদনার ভার বিন্দু মাত্র কমে না।

পেশাগত ভাবে ১৯৬৬ সাল থেকে তিনি কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ-জৈব রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। পড়ানো ছাড়াও তিনি অন্যদের গবেষণা নির্দেশকের দায়িত্ব নিয়েছেন, এবং সময়ের সাথে সাথে বিভাগীয় প্রধান, বিজ্ঞান শাখার পরিচালক, স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর স্তরের পঠন-পাঠন কার্যক্রমের সভাপতি ইত্যাদি নানা দায়িত্বও তাঁর উপর এসেছে। এমনিতে এই পেশাদারী-তথা-শিক্ষালয় সংক্রান্ত এত সব খুঁটিনাটি, নথিবদ্ধ তথ্য হিসেবে পাদটিকায় যোগ করার চেয়ে বিশেষ গুরুত্বের হ'ত না। কিন্তু গুরুত্ব এই খানে যে এইসব অভিজ্ঞতা সম্ভবত তাঁকে সে ধরণের কিছু উপলব্ধীতে পৌঁছুতে সাহায্যে এসে থাকতে পারে যা দেশে ও বিদেশে আরো অনেকেই তাঁদের নিজের মত করে প্রকাশ করেছেন— এখানে সেই সব উপলব্ধীর কথাই বলা হচ্ছে যা চালু শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কঠোর সমালোচনামূলক এবং যা কখনও বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকেও মোড় নিয়েছে। একটি নিবন্ধে (Peoples Council of Education - Outline of a guide to acting in Science) তিনি তাঁর

উপলব্ধী এভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ

স্নাতক ও স্নাতোকত্তর শ্রেণীতে আজকাল যা পড়ান হয় তার সাথে না থাকে ছাত্রদের বিকাশের কোন সম্পর্ক, না থাকে সমাজের ব্যাপকতর প্রয়োজনের সাথে কোন সম্পর্ক।

প্রাণ শক্তিতে ভরপুর মণীদা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে যা কিছু অগ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে তার মুখোমুখি হতে পিছপা হতেন না, এমন কী তা যদি তাঁর কর্মক্ষেত্রে, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ও হয়। সারা জীবন ধরেই জনস্বার্থ-মূলক প্রশ্নে গভীর ভাবে সংবেদনশীল মণীদা সে সম্পর্কিত নানা দিকের উপর বাংলা ও ইংরেজীতে ব্যাপক ভাবে লিখে গেছেন। যেমন সমাজ ও বিজ্ঞানের স্পর্শতল যেখানে মানুষের জীবনের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। বহু সময়েই সরেজমীন তদন্তের ভিত্তিতে এই সব লেখা এসেছে। যেমন, কৃষিক্ষেত্রে আর্সেনিক ও ফ্লুওরাইড জনিত দূষণ। এই বিষয়ের উপর তাঁর প্রকাশিত বইটির নামঃ 'পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যে আর্সেনিক ও ফ্লুওরাইড'। তারও আগে রবীন মজুমদারের সাথে যৌথ ভাবে রচিত পরিবেশের উপর স্নাতক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশিত হয়।

নাগরিক অধিকারের অন্য নানা ক্ষেত্রেও তাঁর গভীর মনযোগ ছিল। বিগত 'বাম' জমানায় নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের মত সবারই জানা নানা ক্ষেত্রে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে ও তার বাইরেও নানা ভাবে জন-প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। আরও আগে রাষ্ট্রীয়, হিংসার বিরুদ্ধে 'অর্চনা গুহ মামলা' নামে সুপরিচিত আইনি লড়াইয়ের'র বার্তা ব্যাপক ভাবে ছড়ানোর ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই মামলায় সত্তর দশকে পুলিশি হেফাজতে অত্যাচারের শিকার অর্চনা গুহ'র ভাই সৌমেন গুহ উকিল না হয়েও আদালতের বিশেষ অনুমতিতে অতি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তার দিদির হয়ে আদালতে আইনি লড়াই লড়েছিলেন এবং জিতেছিলেন (যা নাগরিক অধিকারের স্বপক্ষে আইনী লড়াইয়ের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক বিরল উদাহরণ স্থাপন করেছিল), যদিও আদালত-তথা-আইনী জটিলতায় সেই মামলা'র পরিসমাপ্তি আজও হয়নি। এই আইনী লড়াই-এর বার্তার ব্যাপকতর প্রচারের স্বার্থে এই মামলার উপর Frontier -এ প্রকাশিত একটি রচনা (The Forgotten Decade : Achnd Guha Case) পাঠান হয় ও রচনাটি'র ভাগ্যে পুরস্কার জুটে যায়। ফলে রাষ্ট্রীয় হিংসার বিরুদ্ধে এই আইনী লড়াইয়ের অন্তর্নিহিত বাণী আরও বেশী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। অন্য দিকে, পুরস্কার প্রাপ্ত অর্থের একাংশ পত্রিকার এবং অপরাংশ ওই মামলার উপরে সৌমেন গুহ রচিত একটি পুস্তক (Battle of Archana Guha case against torture in police custoday) প্রকাশনার কাজে লাগে। মণিদার উদ্যোগ ছাড়া এসব কিছুই হ'ত না।

বি-ও-বির জন্ম লগ্ন থেকেই তিনি এর সাথে জড়িত। তাঁর বহু লেখাই এখানে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বেশ কিছু ইংরেজী রচনা কলকাতার Frontier পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য আরও নানা পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞান-তথা-সমাজ বিষয়ক তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ছিলেন চিরকালীন শিক্ষার্থী। যেক্ষেত্রে তাঁর অজ্ঞতা রয়েছে তা জানাতে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না—এটা এমন একটা গুণ যা সব সময়ে আমাদের সবার মধ্যে দেখা যায় না। কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পরে তিনি তাঁর বাড়ীতে একটি ছোট ল্যাবরেটারি বানিয়েছিলেন। তাঁর জানার মধ্যে জনস্বার্থে কাজ, লেখা ইত্যাদির সাথে যুক্ত সবার তিনি অকুণ্ঠ, সোচ্চার সমঝদার ছিলেন এবং আগ বাড়িয়ে তিনি সাহায্য কতে এগিয়ে আসতেন।

তাঁর প্রিয় জনদের থাকার জন্য তাঁদের (মণীদা, কৃষ্ণা বৌদি ও তাঁদের ছেলে মেয়েরা) বাড়ির দরজা সব সময়েই খোলা থাকত। আমরা বহু জন তাঁদের বাড়িতে নানা সময়েই দিন-রাত কাটিয়েছি। সত্তর দশকের অশান্ত সময়ে তাঁদের বাড়ী অনেক সময় সমাজ কর্মীদের মেলবার ও সাময়িক আশ্রয়ের কাজ করেছে।

বিভিন্ন সময়ে সংকটাপন্ন বা সমস্যাক্লিষ্ট নানা জনের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর দরদী মনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। যেমন দারিদ্র্যক্লিষ্ট শৈশবাবস্থা থেকে তাঁর সাহায্যে কেউ কেউ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমের মধ্য দিয়ে গিয়ে পেশাগত ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর বাসস্থান কল্যানীর কোন হাসপাতালে তাঁর পরিচিতদের নিকট জন কেউ থাকলে, রোগীর কাছে যাদের থাকতে হত

তাদের জন্য তিনি খাবার নিয়ে হাজির হতেন।

আমাদের মানুষরা কেউই নিখুঁত হতে পারি না*। মণিদারও কিছু কিছু কান্ড-কারখানায় তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ বোধ করে এরকমও কারু কারু যে বিব্রত হবার বা অন্য আরও কোন অসুখকর অবস্থায় কারণ কখনো ঘটে নি তা বোধ হয় বলা যায় না। কিন্তু এটা সে কথা মনে করার জায়গা নয়। আমরা এখন ভালবাসা ভরা উষ্ণ হৃদয়ের অধিকারী ও আজীবন জনস্বার্থে সচেষ্ট আমাদের সবার মণীদাকে স্মরণ করছি। গভীর শোকার্ত হৃদয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ও সেই বেদনা তাঁর পরিবারের সাথেও ভাগ করে নিচ্ছি।

* এই প্রসঙ্গে সাহিত্য জগৎ থেকে নেওয়া ও নিচে দেওয়া এক জনের অনুভবের টুকরোটি হয় তো প্রাসঙ্গিক মনে হতেও পারেঃ আমার মনে হয় মানব জাতির আগে থেকেই এরকম ধরে নেওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে যে মানুষরা প্রত্যেকেই যেন যার যার মত করে পুরোপুরি একই ছাঁচে (homogeneous.) গড়া...নিজ দেশের উদ্ধারকর্তা যে হাড় কৃপণ হতে পারেন বা যে কবি আমাদের চেতনার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন তিনি যে নাক উঁচু হতে পারেন, এটা জানলে আমরা বিব্রত বা অপ্রতিভ বোধ করি। আমাদের স্বাভাবিক অহম বোধ আমাদের এই দিকে নিয়ে যায়... আমরা চাই যে তাঁরা এই রকম হোন এবং আমাদের কাছে তাঁরা সেইরকমই। এটা ভাবতেও কষ্ট হয় যে Meistersinger-এর (Die Meistersinger von Nurnberg- 'নুরেমবার্গের শ্রেষ্ঠ গায়করা'-তিন দৃশ্যের জার্মান ভাষায় রচিত সঙ্গীতপ্রধান নাটক, যার রচয়িতা ঊনবিংশ শতকের রিচার্ড ওয়াগনার (Richard Wagner) পশ্চিমী ধ্রুপদী সংগীত রচয়িতাদের অন্যতম) quintet (পাঁচটি বাদ্যযন্ত্র বা কণ্ঠের জন্য রচিত সঙ্গীত) রচয়িতা, টাকা পয়সার ব্যাপারে অসৎ ছিলেন এবং যাদের দ্বারা তিনি উপকৃত হয়েছেন তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।....। যাঁরা বলেন যে সুপরিচিত ব্যক্তিদের ত্রুটি গুলি না দেখতে, তাঁরা ঠিক বলেন তা আমি বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয় যে সেগুলি জানাটাই ভাল। তাহলে তাদের মতই জ্বল-জ্বলে নানা ত্রুটি আমাদেরও আছে এটা জানার পরেও আমরা বিশ্বাস করতে পারব যে তাঁদের গুণগুলির কিছু কিছু অর্জনের পথে সেটা কোন বাধা নয়। —'দি সামিং আপ'— সমারেসেট মম *('The Summing Up' by W. Somerset Maugham, -The New American Library of World Literature, Inc. New Yourk, 1961, Fist Published 1938) Page 47)*

সাত বছর ধরে নিয়মিত বেরোচ্ছে

দুর্বার ভাবনা

12/5 নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-700006 ফোন : 033-25437560/7451

ই-মেল : sonagachi@sify.com,URL :www.durbar.org

কলকাতা বই মেলায় স্টল নং 144

অধ্যাপক মণি মজুমদারের সঙ্গে কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা

অমূল্য মণ্ডল

(akm60@rediffmail.com)

অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী ডঃ মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার ও এই প্রতিবেদকের উদ্যোগে কল্যাণীতে একটি পাক্ষিক পত্রিকা (প্রগতি বার্তা) প্রকাশনের কাজ শুরু জরুরী অবস্থা অবসানের পর ১৯৭৭ সালের জুন মাস থেকে। জনবিজ্ঞান ও জনজীবন বিষয়ক এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশনের তাগিদেই আমরা দূরনিকট বহু স্থানে গিয়ে তথ্যানুসন্ধানের কাজ করেছি। জীবনের বহু মূল্যবান অভিজ্ঞতার্জন ও সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার সংস্রবে এসে সমাজজীবনের জটিল সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা জন্মেছে যা প্রগতি বার্তায় প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে, দীর্ঘ তিন দশক সময় ধরে। এক সাথে কাজ করতে গিয়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ঊর্দ্ধে উঠে আমরা হয়ে উঠি উভয়ে উভয়ের বিশ্বস্ত বন্ধু, সহকর্মী ও সমব্যথী। একদম কাছ থেকে স্যারকে দেখে তাঁর বিরল যে সদগুণগুলি প্রকাশ হতে দেখেছি তা অল্প কথায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তিনি ছিলেন অতিশয় আবেগপ্রবণ, সৎ সাহসী, সত্যানুসন্ধানী বিজ্ঞানী এবং সহানুভূতিশীল। দরদী মনের মানবিক ব্যক্তিত্ব। দ্বিখণ্ডিত বাংলার উদ্বাস্তু জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির চরম দারিদ্র, দুঃখকষ্টের কথা কিছুতেই ভুলতে পারেননি। তাই উদ্বাস্তু মানুষদের জীবন কথার সিনেমা, আলোচনায় তিনি ছিলেন অতি উৎসাহী নাগরিক। তাই মরিচ ঝাঁপি থেকে বিতাড়িত ছিন্নমূল মানুষরা বহু সংখ্যায় যখন বানপুরের ক্যাম্পে এসে ঠাঁই নেন তা দেখবার জন্য আমরা ছুটলাম সেখানে তাঁর নেতৃত্বে। আরো কিছু মনে ছাপ ফেলা ঘটনার অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করছি।

১। বানপুর উদ্বাস্তু ক্যাম্পে

২রা মে ১৯৭৯-এ আমরা প্রথম গেলাম কৃষ্ণনগর পুলিশ সুপারের অফিসে। দেখা-করার স্লিপে স্যার লিখলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছেন। সুপারকে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন—আমরা সাংবাদিক হিসেবে ওখানে যেতে যাই। অনুমোদন প্রয়োজন। সুপার কোন রকম অণুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। অনেক বাক্যবিনিময়ের পরে মণিবাবু বললেন—আমরা কিন্তু বানপুর ট্রানজিট ক্যাম্পে যাচ্ছি এবং তা আপনাকে জানিয়ে গেলাম। আমরা বাস ধরে সোজা বানপুর গিয়ে পৌঁছাই। বাধা পেলেই তিনি বলতেন—নদীয়ার এস পিকে জানিয়ে এসেছি। বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলে ও থাকা-খাওয়ার করুণ অবস্থা চোখে দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হলেন। ছিন্ন মূল হতভাগ্য শত শত শিশু নারীপুরুষদের দুর্দশার কাহিনী দ্রুত প্রচার করবার অঙ্গীকার করলেন। সংবাদ সংগ্রহে তাঁর উদ্যম ও সাহসিকতা আমাকে দারুণভাবে উৎসাহিত করল। ফেরার পথে আমরা বানপুর গ্রামে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের বাড়ি খুঁজতে থাকলাম। শুধু নাম জেনে তাকে খুঁজে পাওয়া গেল। সে জানালো কল্যাণীতে থাকবার কোনো ব্যবস্থা না করতে পেরে সে পড়া ছেড়ে মন খারপ করে বাড়িতে বসে আছে। স্যার তাকে কয়েক মাস নিজের বাড়িতে রেখে পরীক্ষা দেবার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

২। ইটভাটা

শহর কল্যাণী ও গঙ্গার মধ্যবর্তী এলাকায় রয়েছে বিশাল চর, যা গঙ্গা বরাবর কয়েক মাইল দীর্ঘ। পলি জমে জমে চর উঁচু হয়ে যাওয়ায় এখানে গজিয়ে উঠেছে কিছু স্থায়ী ও অনেক অস্থায়ী বাড়িঘর। চরায় অনেক চাষযোগ্য জমি থাকায় আশপাশের কৃষকরা এখানে চাষাবাদ করে। ভাগ্য প্রসন্ন হলে চাষীরা কোনো কোনো বছর ভাল ফসল বিশেষত শীতকালীন শাকসব্জি, মুসুর, মটর, সরষে এবং আউসধান ঘরে তোলে। এই গঙ্গার চরে একে একে কয়েক-ডজন ইটভাটায় শীতে ইট তৈরি হয়। প্রগতিবার্তায় খবর আসে যে ইঁটভাটাগুলি চাষের দারুণ ক্ষতি করছে। একদিন আমরা ওখানে যাই। দেখা গেল ইটভাটার বড় বড় গর্ত (মাটি কাটায় তৈরি) পাশের চাষের জমি ভেঙ্গে নিচ্ছে নয়তো জমির জল টেনে নিচ্ছে।

ফলে চাষের ক্ষেত শুকিয়ে যাওয়ায় ফসল মার খাচ্ছে। একদিকে অসহায় গরীব চাষী অন্যদিকে ভাটা মালিকদের অর্থ ও বাহুবল। কেউ কিছু বলতে পারেনা। এই জমিগুলির কোনো মালিকানা নেই। সবই জবরদখল করা। প্রতিটি ইটভাটায় কাজ করছে বিভিন্ন ধরণের কাজে ভিন্‌দেশী দরিদ্র, অপুষ্টিক্লিষ্ট বিভিন্ন বয়সের কিশোর কিশোরী, কম ও বেশী বয়সের মহিলা ও পুরুষকর্মী। সংখ্যায় অনেক। বেশ কিছু কচি বাচ্চাকে মাটিতে গামছা পেতে শুইয়ে রেখেছে মহিলা শ্রমিকরা। এইসব দেখে স্যার বললেন— চলো তো ভাটায় গিয়ে মালিক বা তার লোকজন, সর্দার, ঠিকাদারদের সঙ্গে কথা বলা যাক নিজেদের ব্যক্তিগত পরিচয় দিয়ে স্যার ওদের উদ্দেশ্যে কথা বলার প্রস্তাব দেন। সাড়া না দেওয়ায় তিনি বললেন—আমরা আপনাদের কাছে কিছু তথ্য জানতে চাই। সহযোগিতা চাই। অন্যথায় আমরা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে সব জানাব। ধমকে কাজ হলো। তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের মজুরী, এদের বাড়িঘরের কিছু হদিশ করা গেল। পরে আমরা কিছু শ্রমিকদের ও তাদের নেতাদের সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। ভাটায় আদিবাসী শ্রমিক বিশেষ করে মহিলা শ্রমিকদের শোষণ ও বঞ্চনার বিষয়গুলি নিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্য মহাশ্বেতা দেবী একাধিকবার এসেছেন। সব ক্ষেত্রেই স্যারের ভূমিকা ছিল উল্লেখ্য।

৩। সিমেন্ট কারখানার জন্য শুনানী

কল্যাণী 'এ' ব্লকে একটা সিমেন্ট তৈরির কারখানা হবে। যেহেতু এই কারখানা থেকে দারুণ দূষণের সৃষ্টির সম্ভাবনা তাই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে একটা নো অবজেকশন শংসাপত্র সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক। এর জন্য প্রয়োজন স্থানীয় এলাকায় একটা জনশুনানীর ব্যবস্থা করা এবং সম্ভাব্য দূষণ জনিত প্রভাব পরিমাপ করা।

রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, কল্যাণী ও গয়েশপুর পুর সভার চেয়ারম্যান ও সিমেন্ট কোম্পানীর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জনশুনানীতে প্রগতি বার্তার অধ্যাপক মণি মজুমদার ও এই প্রতিবেদক ছাড়াও কয়েকজন সচেতন নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। কম্পানীর প্রতিনিধি ও দূষণ পর্ষদের প্রতিনিধিরা প্রায় একই সুরে কথা বলেন।

মণিবাবু ও তাঁর নির্দেশমত আমি বেশ ককেয়টি থানইটের মত বই বহন করে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেগুলি টেবিলে পরপর সাজানো ছিল। আমাদের বলার সুযোগ এলেই মণিবাবু একদম ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি অনেক উদাহরণ দিয়ে দিয়ে অ্যাসবেস্টস ও সিমেন্ট কারখানার দূষণ বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখলেন। উপস্থিত নাগরিকরাও ডঃ মজুমদারের বক্তব্যকে সমর্থন করলেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সভায় কারখানা স্থাপনের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪। নদীয়ার জেলা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

যথাযথ অনুমতি নিয়ে খানিকক্ষণ বাইরে অপেক্ষার পর আমাদের ডাক পড়লে আমরা ভিতরে গিয়ে দাঁড়াই। দেখলাম মহিলা ডি এম মনোযোগ দিয়ে কিছু লিখছেন। যে-কোনো নাগরিকের সঙ্গে দেখা করা এইসব পদ-আধিকারিকদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। মুখ না তুলে তিনি বললেন—বলুন কী আছে। স্যার তখন সজোরে বললেন—হয় আগে আমাদের কথা শুনুন নয়তো আপনার কাজ শেষ করে নিন। কল্যাণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ফেলে এসেছি। আমাদের সময়েরও তো দাম আছে। এবার ভদ্র মহিলা মুখতুলে বললেন—বসুন। শুনছি। বক্তব্য শেষ করে আমরা বাইরে চলে এলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন শিক্ষকের নাম করে আমাকে স্যার বললেন—শোনো, এদের চেহারা, পোশাক-আশাক ও কথা বলার ভঙ্গিমাতে অপরিচিত কোনো আধিকারিক তাঁদের যথেষ্ট সমীহ করে কথা বলবেন এবং বসার জন্য চেয়ার দেবেন। কিন্তু আমাদের চেয়ারটা আদায় করতে হয়, বিশেষ করে এই সব ক্ষেত্রে।

৫। ভারতের প্রেস কাউন্সিলের সভায়

১৯৮৩ সালে রাজ্য সরকারের জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর প্রগতি বার্তায় সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশ বন্ধ করে দেয়, নানা অজুহাত দেখিয়ে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে। সরকারি বিজ্ঞাপন ছোট পত্রিকা প্রকাশে বিশেষ সহায়তার ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় শাসকদলের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ও স্থানীয় প্রশাসনের কার্যকলাপ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মে অযথা হস্তক্ষেপ ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের সমালোচনামূলক সংবাদ ও লেখা প্রগতি বার্তায় নিয়মিত ছাপা হতো। জেলা বিজ্ঞাপন পরামর্শদাতা কমিটির স্থানীয়

সদস্যের কারসাজিতে বিজ্ঞাপন বন্ধও করেদেওয়া হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ডিএভিপি-এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রকাশ তখনও অব্যাহত ছিল।

জেলা বিজ্ঞাপন পরামর্শদাতা কমিটির ও জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের এই বেআইনী কাজের অভিযোগ জানিয়ে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনেক আবেদন নিবেদন করে কোনো কাজ না হওয়ায় ভারত সরকারের প্রেস কাউন্সিলের নিকট প্রগতিবার্তার পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হয়। দিল্লীতে একাধিকবার শুনানীর জন্য ডাকা হলেও আমাদের সেখানে যাওয়ার অক্ষমতার কথা জানিয়ে আমরা চিঠি দিয়েছি। আমরা এটাও জানিয়ে দিয়েছি যে প্রেস কাউন্সিলের যে কোন সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নেব। তিন বছরের মধ্যে কলকাতায় রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে প্রেস কাউন্সিলের সভা ডাকা হয় ২৪ শে ডিসেম্বর ১৯৮৫ তারিখে। স্যার এবং আমি সমস্ত কাগজপত্র ও সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে সেখানে হাজির হই। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি এ. এন. সেন সহ ১৪/১৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। শ্রীসেন অভিযোগকারীদের সঙ্গে সামান্য আলাপচারিতা করেন। সেই সুযোগে ড: মজুমদার বামফ্রন্ট সরকারের এবং স্থানীয় দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু প্রসঙ্গ সজোরে তুলতেই চেয়ারম্যান বক্তব্য থামিয়ে দিয়ে জানালেন উপস্থিত সকল কাউন্সিল সদস্যই অভিযোগগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল আছেন। তাই আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি-তথ্য দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা প্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে শ্রীসেন বলেন—সরকারি আইনবিরুদ্ধ কাজের জন্য জনগণ কেন ভুগবেন? অন্যান্য সদস্যরাও একযোগে শ্রীভট্টাচার্যকে রাজ্য সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করেন।

যুগ্ম অধিকর্তা স্বীকার করেন জেলা তথ্য দপ্তর কাজটা ঠিক করেনি। শীঘ্রই ভুল সংশোধন করা হবে।

জনৈক সদস্য বলেন—এখনই কিছু একটা করুন, এবং প্রগতি বার্তাকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলেন। বিচারক শ্রী সেন নির্দেশ দেন—এখনই নদীয়া জেলাকে ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা করতে বলুন। প্রাণকৃষ্ণবাবু প্রগতি বর্তাকে আগামী অর্থ-বর্ষ থেকে বিজ্ঞাপন দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। একটি বিশেষ বিজ্ঞাপন মহাকরণ থেকে দেবার ব্যবস্থা করেন।

৬। কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ-এর প্রধান কার্যালয়ের সন্ধান

১৯৯৮, ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে স্যার ও আমি কেরালা ও তামিল নাড়ু বেড়াতে যাই। ২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আলেপ্পীতে পৌঁছেই বহুজনের কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করি কেরালা বিজ্ঞান আন্দোলনের হোতা কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ এর অবস্থান। বেশ কয়েকজন জানান যে সিপিএম পার্টি অফিসে সন্ধান করলে পাওয়া যাবে। তবে এখানে নয়, ত্রিবান্দ্রমে।

পরের দিন ব্যাকওয়াটার জার্নি করে আলেপ্পী থেকে কুইলন (কোল্যাম) যাই। যেখান থেকে ট্রেনে ত্রিবান্দ্রম গিয়ে রাত কাটাই। পরের দিন (২৪. ১২. ৯৮) সিপিএম পার্টি অফিস থেকে কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদের অপিসে ফোনে যোগাযোগ করে সেখানেই গিয়ে হাজির হলাম। তখন এর সভাপতি ছিলেন জনৈক পরমাণু বিজ্ঞানী। নিজস্ব একটা বড় বাড়িতে নানা ধরনের কাজকর্ম হচ্ছিল। এই বিজ্ঞান ক্লাবের কাজ করতে কোথায়ও কোন বাধা পেতে হয়নি বলে তিনি জানান। শাসক দল (সিপিএম) এই পরিষদের সঙ্গে যুক্ত থাকায় পরিষদের বাজেটও বেশ বড়। কিন্তু পার্টির বাইরের লোকজনের ধারণা পরিষদ সিপিএমের একটি সংগঠন। তাই অন্যদের যোগাযোগ কম। তবে আমরা সভাপতির (যিনি সরকারের পরমাণু নীতির বিরোধিতা করে চাকরী থেকে পদত্যাগ করেছেন) সঙ্গে আলাপ করে খুশী।

৭। রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্ত ও রিপোর্ট প্রকাশ

শিমুরালী রেল ষ্টেশন থেকে পশ্চিমদিকে গঙ্গার কাছাকাছি গ্রাম কালিপুর। গ্রামে সিপিএম দলের অনেক সমর্থক থাকলেও জরুরী অবস্থার সময় অনেকেই পালিয়ে যায়। সক্রিয় কর্মী ভজহরি বিশ্বাসও গঙ্গার ওপারে দীর্ঘকাল কাটিয়ে বামফ্রন্ট রাজ্যে ক্ষমতায় (১৯৭৭) আসার পর নিজগৃহে ফিরে আসেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তার মনোমালিন্য ও দলীয় কাজে নানা অসুবিধা সৃষ্টি হতে থাকে। ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের এটা বোধ হয় বৈশিষ্ট্য—যারা শহরকেন্দ্রিক বা শহরে যাতায়াত বেশী

তারা তাড়াতাড়ি নেতৃত্বে চলে আসেন। ভজহরিবাবু দীর্ঘদিন বাড়িঘর ও সংসার ছেড়ে নানা জায়গায় লুকিয়ে দিন কাটিয়েছেন। তার বাড়িতে ৩টি শিশু সন্তানসহ সবাই অতি কষ্টে দিন কাটিয়েছেন।

মানসিক দ্বন্দ্ব ও কমরেডদের সঙ্গে দারুণ মতপার্থক্য তাকে রাগে, অভিমানে, দারিদ্রে আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়। দলীয় এই খবর বাইরে প্রকাশ পাচ্ছিল না। খুব প্রবীণ, প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও এতদঅঞ্চলের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা বলে পরিচিত কালাচাঁদ চক্রবর্তী আমাদর এইসব কথা জানান এবং সত্য অনুসন্ধানের পরমার্শ দেন। তখন মণিবাবুর প্রতিবেশী ও সহকর্মী বিনয় বিশ্বাস ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক (১৯৭৭—৮২)। কালাচাঁদবাবুর ঘনঘন যাতায়াত ছিল এই দুটি বাড়িতে। আমাদের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ায় মদনপুরের কয়েকজন উঠতি নেতার বিষয়ে পার্টি কড়া মনোভাব প্রকাশ করেছিল। এদের হাতেই ছিল সরকারি টাকা খরচের ভার। আর যেখানে সরকারি টাকা সেখানেই দুর্নীতি বাসা বাঁধে।

নির্দল প্রার্থী হিসেবে বামপন্থী অধ্যাপক বিনয় বিশ্বাস নিহত ভজহরি বিশ্বাসের স্ত্রীকে কল্যানী জে এন এম হাসপাতালে একটি আয়ার কাজে নিযুক্ত করতে পেরেছিলেন।

৮। খলসির বিলে খুন

চাকদহ বা কাঁচরাপাড়া স্টেশন থেকে নিমতলা যাওয়ার পথে বাসে খলসির বিল যাওয়া যায়। শ'খানেক একরের এই বিলের অদূরেই রয়েছে শ' তিনেক একরের জলা নিয়ে ভোমরার বিল।

খলসির বিলে পুরুষানুক্রমে স্থানীয় মৎস্যজীবীরা সামান্য খাজনার বিনিময়ে মাছ ধরে খেয়ে বাঁচত। ষাটের দশকে কিছু শহরবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তি এখানে অর্থ ও তথাকথিত "আইনের বলে" বিলের দখল নেয়। তখন থেকেই মৎস্যজীবীদের সঙ্গে গোলমাল শুরু হয়। এর মধ্যে মালিকানা নাকি হাত বদলায়। কাঁচরাপাড়ার দেবেন বাড়ৈ, হারু কুণ্ডুরা টাকার জোরে বিলের দখল কায়েম করে।

বাঁচার তাগিদে মৎস্যজীবী সমিতি বিশ্বনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে আন্দালন শুরু করে। দীর্ঘ চার বছর বামফ্রন্টের শাসন চললেও বাম- নেতৃবৃন্দ নানা অজুহাতে বিষয়টি নিয়ে খানিকটা উদাসীন থাকেন। বিশ্বনাথ গণফ্রন্ট নামক বামপন্থী সংস্থায় যোগ দিয়ে আন্দোলন জোরদার করেন। সিপিএম বিষয়টা মোটেই ভাল চোখে দেখে না। যদিও বিশ্বনাথ ছিলেন দীর্ঘকালের পোড় খাওয়া সিপিএম-কর্মী ও নেতা। বিলের জমি সরকারকে খাস করবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জোগাড় করে লড়তে থাকেন। পঞ্চায়েতও সহযোগিতায় শিথিলতা দেখায়। বিশ্বনাথের জোর ছিল স্থানীয় কয়েকশ' মৎস্যজীবী পরিবার, সৎ প্রচেষ্টা ও কঠোর শ্রম। কিন্তু শেষ রক্ষা হলনা।

২৯ শে আগস্ট ৮১ গভীর রাতে একদল দুর্বৃত্ত দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত বিশ্বনাথকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে, বৃদ্ধ বাবা ও ভাইদের প্রচণ্ড মারধর করে পালিয়ে যায়। ৭টি সন্তানসহ বিধবা স্ত্রী অসহায় হয়ে পড়েন। এই সংবাদ সংগ্রহে নানা বাধা সত্ত্বেও মাকালগছি গ্রাম থেকে এই বিষয়ের তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রকাশ ছিল একটা চেলেঞ্জ। কিছুদিন পরই সরকার বিলটি খাস বলে ঘোষণা করে। স্যার লিখেছিলেন 'বিশ্বানাথ খুন হল, খলসির বিলে একটিও ঢেউ উঠল না।'

মণিদা-শ্রদ্ধায় ও স্মরণে

রণজিৎ সেনগুপ্ত
(ranajitsg@gmail.com)

গত ৭ই জুন ২০১৫ সাল বিকালে মণিদা (ড. মনীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার) তাঁর কল্যানীস্থ নিজ বাসভবনে আমাদের মায়া কাটিয়ে ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। খবরটি আমি পাই ৮ই জুন সকাল আটটায়। মণিদার ভাগ্নে ভাইয়ো আমাকে ফোন করে এই দুঃসংবাদটি দেয়। খবরটি শুনে আমি কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে যাই। দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে আমার চোখ থেকে। খবরটা সঙ্গে সঙ্গে কাবেরীকে (আমার স্ত্রী) জানাই; ওরও সেই অবস্থা। দুজনের চোখেই জল। মণিদাকে আমরা ওঁর ডাকনামেই (কালুদা) চিনি। সংবাদটি একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কারণ ওঁর সর্বশেষ ইমেলটি পেয়েছি ১১ই মে, ২০১৫-তে। অবশ্য আমিও ৪ঠা জুন একটি মেল করি একটি জিনিস জানার জন্য। কিন্তু উত্তর পাইনি। তখন থেকেই মনটা উদ্বিগ্ন ছিল। কেননা ওঁর শরীরও ইদানীং খুব ভালো যাচ্ছিল না। খুব অসুস্থ ছিলেন; কিন্তু তার মধ্যেই ফোন ও মেল করে যাচ্ছিলেন আমাকে। মণিদা যে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন ভাবিনি কখনও। তাঁর কর্মময় জীবনের এত দ্রুত পরিসমাপ্তিতে আমাদের দুঃখ হবেই, তার কারণ তাঁর সঙ্গে পরিচিতি তো আজ থেকে নয়; পাড়ার লোক বলে আমাদের সঙ্গে পরিচিত সেই ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে, ভদ্রেশ্বর গভঃ কলোনিতে আসার সাথে সাথে। মণিদা এখানে আসেন, তাঁর বিবৃতি অনুযায়ী, ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে। ভদ্রেশ্বর রেল সেটশনের নিকটবর্তী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার আমেরিকার মিলিটারিদের পরিত্যক্ত ক্যাম্পে টালির চালের আড়াইখানা ঘরে, তাঁর কথায়, তাঁর পরিবারের দশজনের বসবাস শুরু। প্রকৃত জন্মসাল বা তারিখ জানা নেই আমার। প্রকৃতপক্ষে হয়তো মণিদার নিজেরও তা জানা ছিলো না, কারণ খুব ছোটোবেলায় তাঁর মা মারা যান। ১৯৪৯ সালে ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে দাদার হাত ধরে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হবার সময় দাদা যে বয়স দেন, সেটা ১৯৩৮ সাল, মণিদার বক্তব্য অনুসারে। এরপর তাঁর কথায় বলি, "তেলিনীপাড়া বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪ পর্বের ছাত্র হিসাবে বিদ্যালয়-জীবন শেষ করে চন্দননগর কলেজ থেকে আই. এস. সি., কোলকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে রসায়নে বি. এস. সি. এবং ১৯৬০ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজাবাজার সাইন্স কলেজ থেকে রসায়নে এম. এস. সি. ও সেখান থেকেই ১৯৬৫ সালে ডক্টরেট করে ১৯৬৬ সালের প্রথম থেকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগ দিই। ২০০৩ সালের জুলাই মাসে ৬৫ বছর সমাপ্ত হয়; অবসর নিয়ে আনন্দিত ও সুস্থ জীবনে আছি। মাঝে ১৯৬১ সালের সুরেন্দ্রনাথ কলেজে এক বছর অধ্যাপনা; পৌনে দুবছর পদার্থ বিজ্ঞানে গবেষণা করে আবার অধ্যাপক হিসাবে বিদ্যাসাগর কলেজে আড়াই বছর চাকরি করে কল্যাণীতে আসি। ১৯৭০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পড়াশুনা, বিজ্ঞান গবেষণা, সাংবাদিকতা, বিজ্ঞান ও সমাজবিষয়ক বহুবিধ কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত ছিলাম ও আজও আছি—এটাই আমার ইচ্ছা।" তাঁর স্কুলের জন্মসাল ১৯৩৮, যা পূর্বেই বললাম, সেটা মণিদার লেখার থেকেই তুলে ধরলাম। অবসর জীবনের শেষের দিকে মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে এসে আড্ডা দিতেন। এই আড্ডা দেবার সময় মজা করে বলেছিলেন....জানো রণজিৎ, আমাদের যারা সর্বহারা হয়ে ওদেশ থেকে এদেশে এসেছি, তাদের দুটো জন্মতারিখ-একটা প্রকৃত, যেটা সচরাচর অনেকেরই জানা নেই, যেমন আমার; আরেকটা স্কুলে ভর্তি হবার সময় অভিভাবকরা যে বয়সটা দিয়েছেন, সেটাই চলে আসছে। ঘটনাচক্রে আমিও ঐ স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করি ১৯৬৫ সালে, একই হেড-মাস্টার মহাশয় ছিলেন আমাদের-জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর নিজের কথায়, তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু নিষ্ঠা ও পরিশ্রম এবং জানার আগ্রহে ভরপুর ছিলেন।

নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও আগ্রহ থাকলে খুব মেধাবী না হয়েও অনেক দূর পর্যন্ত যে যাওয়া যায়—মণিদাই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁর সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত ১৯৫৫ সাল থেকে হলেও আলোপের গাঢ়ত্ব ও নিবিড়তা হয় আমি যখন বি. এস. সি.-তে পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পড়ি উত্তরপাড়া কলেজে। সেই সময় আমাদের কলেজে ওনারাই এক সহপাঠী ইন-অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়াতেন-ক্ষেমেন রায় (কে. আর)। তখন আমরা আর্থিক কারণে খুব কম বই-ই কিনতে পারতাম। তাই লাইব্রেরিই ভরসা ছিল। উনি তখন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক-আমাদের পাড়ার বাড়ি থেকেই যাতায়াত করতেন। আমি তাঁর কাছে এক রবিবার গিয়ে কিছু বইয়ের সাহায্য চাইলাম। উনি বেশ কয়েকটি বই দিয়ে আমায় সাহায্য করেছিলেন। এখনও আমার কাছে ওনার দেওয়া বসু, তুলি এবং সত্যপ্রকাশের রসায়ন বইটি সযত্নে রাখা আছে। মণিদার কথা মনে হলেই আমার ছোটোবেলার একটি চিত্র চোখের সামনে ফুটে ওঠে স্মৃতির মণিকোঠা থেকে। সেটি হল : তখন মণিদা তরুণ বয়সে আই. এস. সি.-তে পড়েন হয়তো। এক স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে তখনকার কংগ্রেস বিধায়ক বিখ্যাত ব্যোমকেশ মজুমদার পার্ক ময়দানের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং বিখ্যাত বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সভাপতি। আমি তখন নয়-দশ বছরের বালক। মণিদাকে কিছু বলতে বলা হয়েছিল। উনি স্বাধীনতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সারা বিশ্বের নিপীড়িত দেশের উদাহরণ উল্লেখ করে এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তখনই আমি তাঁর সুবেদী মনের পরিচয় পাই। বিভিন্ন দেশের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার সঙ্গে তুলনা টেনে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা সবাইকে একটু অবাকই করেছিলো। সেই বক্তৃতা শুনেই আমার প্রথম সম্ভ্রম-জাগানো, শ্রদ্ধা- মেশানো মনোভাবের জন্ম তাঁর সম্বন্ধে। যখন তিনি কল্যাণীর স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান, তখন আমাদের পাড়ায় যখনই ভদ্রেশ্বরে দিদিকে (মায়া মজুমদার) দেখতে আসতেন, আমার বাড়িতে আড্ডা দিতে আসতেন। ঠিক সময় ধরে আড্ডা দিয়ে কখনও চা খেয়ে, কখনও চা না খেয়ে বলতেন, রণজিৎ, চলি, আড্ডার সময় শেষ। এইরকম কত টুকরো টুকরো স্মৃতি মনে ভেসে উঠছে মণিদার সম্পর্কে লেখার সময়। ওনার মামাতো দাদা শৈলেন মজুমদার (মন্টুদা) আমার বাড়িতে রোজই আড্ডা দিতে রাতের দিকে আটটা-সাড়ে আটটায় আসতেন। মণিদা ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন ও ভালোবাসতেন। মনে হয়, স্কুলে যে দাদার কথা ভর্তির সময় বলেছিলেন তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জিতে, তিনিই সম্ভবত মন্টুদা। একবার মন্টুদার সঙ্গে আমরা সপরিবারে কল্যাণীর বাড়িতে গিয়েছিলাম; সেদিন সে কি অঝোরে বৃষ্টি! ফিরতেই পারিনি। সে রাত্রে জমিয়ে আড্ডা ও খিচুড়ি ডিমভাজা খাওয়ার কথা স্মৃতিপথে ভেসে ওঠে।

ছোটোবেলা থেকেই চোখ খুব খারাপ ছিল। তাই রাতে পড়া প্রায় হতই না তাঁর। সেই অবস্থায় জীবনে পড়াশোনার ক্ষেত্রে এই অবস্থায় এমন উচ্চতায় ওঠা যে কী পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আগ্রহের ব্যাপার ছিল, তা ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়! মণিদার কথা বলতে বসলে হাজার স্মৃতি মনে ভিড় করে আসে। আগেই বলেছি, আমাকে মণিদা শেষ মেল করেছিলেন ১১. ০৫. ২০১৫-তে। 'আমাদের হাসপাতাল'-এর উপর আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপানো একটি প্রতিবেদনের প্রতিলিপি পাঠায় স্ক্যান করে। আর শেষ দেখা হয় ১৪ই এপ্রিল, ২০১৫-তে খড়দায়। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর' বন্ধু-সম্মেলনে আমি আর বিদ্যুৎ (বিশ্বাস) হাজির ছিলাম সেখানে; শরীর তখন খুবই খারাপ ছিল। সঙ্গে সর্বক্ষণের সঙ্গী সমরকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। চলেও যান তাড়াতাড়ি, না খেয়ে।

গত ২৯. ০৩. ২০১৫ থেকে ০২.০৪.২০১৫-তে ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব স্যোশাল সাইন্স (আই. এস. এস.এ.) ও অন্ধ্র ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আটত্রিশতম সেশন অব ইন্ডিয়ান স্যোশাল সাইন্স কংগ্রেসে পেপার পড়তে যাবেন মণিদা। তার মাসখানেক আগে আমাকে ফোন করে বললেন, তুমিও তো আমার সঙ্গে যেতে পারো, রণজিৎ, পারলে একটা পেপার তৈরি করে নাও; নিয়ে চলো, ওখানে পড়বে, এত পড়াশোনা করো বিভিন্ন বিষয়ে, পেপার তৈরি করোনা কেন? ৩০ দিনের মধ্যে পড়াশোনা করে পেপার তৈরি করার ক্ষমতা আমার নেই তাঁর মতো-একথা বলায় খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। এইরকমভাবে সবসময় সবাইকে উৎসাহ দিতেন। আমি

বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়াশোনা করি বলে আমার কাছে কোন কোন বিষয়ের কী কী বই পড়েছি, মাঝে মাঝেই জানতে চাইতেন; কী কী বই পড়তে হবে তার উপদেশও দিতেন। সেইসব বই যদি আমার কাছে না থাকে, ওনার কাছে থাকলে জেরক্স করে পাঠিয়ে দিতেন। আমাকেও বলতেন, আমার কোনো বই জেরক্স করে পাঠিয়ে দিতে। সবসময় বলতেন, ভালো ভালো বই পড়বে, ভালো ভালো লোকের সঙ্গে মিশবে, তাতে জ্ঞানের প্রসার হয়। আমি একবার ওঁকে বললাম, আপনি এত লেখালিখি করেন, বিভিন্ন বিভাগ ও বিষয় নিয়ে, আপনার জীবনের ঘটনা বা দেশবিভাগ নিয়ে কিছু লেখেননা কেন? এটা বলেছিলাম, যখন আমি মিহির সেনগুপ্তের আনন্দ পুরস্কার-প্রাপ্ত বই 'বিষাদবৃক্ষ' তাঁকে পড়ার জন্য পাঠাই। কাকতালীয়ভাবে মিহিরদা ভদ্রেশ্বর নিবাসী। মণিদা 'বিষাদবৃক্ষ' বইটি পড়ে নিয়ে মিহিরদাকে সরাসরি ফোন করে বলেন, ভেবেছিলাম দেশবিভাগ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা বই লিখব। কিন্তু আপনার বইটা পড়ে আমার সে চিন্তা চলে গেল। আমি আর লিখছিনা—এই মণিদা। একবার আমার বাড়ির আড্ডায় কাবেরীকে হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, মাধ্যমিকে তুমি যে কবিতা পড়েছো, তার একটা আবৃত্তি কর। কাবেরীর তখনকার কোনো কবিতা মুখস্থ নেই। ও বললো, আমি পারবনা। উনি বললেন, কী যে তোমাদের স্মৃতিশক্তি, আমাকে এখন বলে দাও, স্কুল ফাইনালের কোনো কবিতা ইংরেজি কি বাংলা, আমি আবৃত্তি করে দেবো। আমাকে একবার বললেন, রণজিৎ, ধরো তোমার আমগাছে সুন্দর একটি পাখি বসে ডাকছে। তুমি কি এখনও সেটা দেখে অবাক হও? তোমার ভালো লাগে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমারও হয়। অবাকই যদি না হও, তাহলে আর কিছু সৃষ্টি করা যায় না। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে "আমাদের হাসপাতাল"-এ প্রথম মণিদা আর আমরা একসঙ্গে গেলাম। আমাকে খুব করে যেতে বলায় আমি আর কাবেরী সেখানে গেলাম। জায়গাটি বাঁকুড়ায়। তিনি আমাদেরকে হাসপাতালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেই হাসপাতালের কর্ণধার ডা. পীযূষকান্তি সরকার এবং তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণা সরকারের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেই শুরু আমাদের হাসপাতালের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার। ডা. পীযূষকান্তি সরকার ও কৃষ্ণা সকরার কী অসম্ভব ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন মণিদাকে, তার পরিচয় পেলাম সেবার। পরে, ২০১৪ সালের ২৩শে নভেম্বর আমাদের হাসপাতালের ষষ্ঠবার্ষিকীতে আবারও আমরা একসঙ্গে গেলাম। সেবার মণিদা একলাই গেলেন। কৃষ্ণা বৌদি গেলেন না। দু'বারই আমাদের সঙ্গে কাবেরী ছিলো। কত যে আনন্দ হয়েছে দু'বারই, কিন্তু দ্বিতীয়বার মণিদার শরীর অসুস্থ থাকায় বেশিদিন থাকলাম না। তৃতীয় দিনেই ফিরে আসি। প্রথমবার ওখান থেকে আমরা বিষ্ণুপুর বেড়াতেও গিয়েছিলাম গাড়ি করে। খুব আনন্দ হয়েছিলো। হইহই করে আমরা দু'বার আমাদের হাসপাতালে গান-বাজনা-আবৃত্তি সহযোগে দিনগুলো কাটিয়েছি; সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাজ করে। সেই স্মৃতি এখনও অমলিন আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, তাঁর ছিল এক অসম্ভব সুবেদী মন, গরিবের প্রতি ভালোবাসা; আমাকে মাঝে মাঝেই ফোন করে বলতেন, রণজিৎ, এদের জন্য আমরাও কিছু করতে পারি ডা. পীযূষ সরকারের মতো। সেটা যেরকমভাবেই হোক। সমাজের থেকে কত কিছু নিই আমরা। কিছুটা অন্তত তাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিৎ। সেটাও আমরা করছিনা। কিছু করো, কিছু করো। এককালে মার্কসবাদের উগ্র সমর্থক ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে কিছুটা মোহভঙ্গ হয়। অন্তত কথাবার্তাও ও লেখালিখিতে কিছুটা তার আভাস পেতাম। কারণ হিসাবে উল্লেখ করতেন, মরিচ ঝাঁপি, সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা। এসব জায়গায় তিনি নিজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য গিয়েছিলেন এবং তাদের অত্যাচারের কাহিনী শুনেছিলেন বেশ কয়েকবার গিয়ে। তাঁর আর্সেনিক ও ফ্লোরাইডের উপর লেখালিখি ও গবেষণামূলক কাজ সারা ভারতের এক দিগদর্শন। এর উপর নিজ-অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ দু'টি বই প্রকাশ করেছিলেন—একটি নিজে ও আরেকটি "ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট" থেকে। বুক ট্রাস্টের কলেজ স্ট্রীট শাখায় আমি তাঁর সঙ্গে যাতে যাই, কপ্লিমেন্টারি কপিগুলো আনতে, তার জন্য আমাকে ফোন করে বললেন; আমি গিয়েছিলাম। সমরও সঙ্গে গিয়েছিলো। আমি তাঁর বিস্তৃত কর্মময় জীবন, তাঁর লেখালিখির কোনো উল্লেখ আর করছিনা; তা বিদগ্ধজনের অনেকেই করবেন আশা করি। শুধু আমার তাঁকে

নিয়ে স্মৃতিকথা মনে করলাম।

পরিশেষে বলি, হয়তো তাঁর জীবনস্মৃতি লেখার ইচ্ছা ছিল-সেরকমই ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন একটি লেখায়, যা আমাদের তেলিনীপাড়া স্কুলে প্রাক্তনীদের দ্বারা প্রকাশিত ম্যাগাজিনে "পুরোনো সেই দিনের কথা" বলে ছাপানো হয়েছিলো ২০০৮ সালে ১২৫ বছরের প্রাক্তনীদের বার্ষিক উৎসবে। এই লেখাটা আমিই তাঁকে লিখতে অনুরোধ করেছিলাম স্কুল ম্যাগাজিনে পাঠাতে। প্রাক্তনীদের বার্ষিক উৎসব কমিটির সভাপতি ভূপতিদা (ঘোষ) নিজে এসে আমার বাড়িতে ওনার হাত থেকে সেই লেখা নিয়েছিলেন। সেই জীবনস্মৃতি আর লেখা হল না; তার আগেই তিনি প্রয়াত হলেন। মানুষ অমর নয়, কিন্তু কিছু কিছু মানুষ সৃষ্টিশীলতার মধ্যে বেঁচে থাকেন। তাঁদের কর্মময় জীবন আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, প্রেরণা দেয়, সবসময় উৎসাহ যোগায়; মণিদা সেইরকমই মানুষ। যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, তারাই শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় তাঁকে স্মরণে রাখবে সারাজীবন। মণিদা আর নেই, তাঁর উৎসাহব্যঞ্জক কথাবার্তা, বা তাঁর সেই 'পাঁচ মিনিট'-এর ফোন-আড্ডা আর হয়তো পাবোনা ঠিকই, কিন্তু তাঁকে ভোলা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। রবীন্দ্রনাথের কথা ধরে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বলি, "সমস্ত বিশ্বসত্তার পরম গতির মধ্যে তাঁর (মণিদার) অবাধ গতি হোক। আমাদের দুঃখশোক যেন তাঁকে একটুও পিছনে না টানে। তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য নেই; শুধু কামনা করি; কেবল কামনাই করতে চাই; ' যে বিরাটের মধ্যে তাঁর গতি, সেখানে তাঁর কল্যাণ হোক; আমাদের সেবা বা শ্রদ্ধা সেখানে হয়তো পৌঁছাবে না; কিন্তু আমাদের ভালোবাসা সেখানে অবশ্যই পৌঁছোয়, না হলে ভালোবাসা টিকবে কেমন করে"। তাঁর কর্মময় জীবনের প্রতি আমাদের অসীম শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি, তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, তাঁর পরিবার বর্গের প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাই। তাঁর কর্মময় জীবন যেন আমাদের চলার পথের পাথেয় হয়-এই প্রার্থনা। গীতার শ্লোক মনে পড়ছে—

'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'।

ভিন্ন স্বাদের কিছু পুস্তক পুস্তিকা পত্রিকা

● নিউক্লিয়ার বোমা নয় ● রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকারের ঘোষণা ● মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা ● পরিবেশ দূষণ : পরিচিতি ও পরিমাপ ● পরিবেশ আইন-কানুন ● হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান ● বিজ্ঞান সমাজ মানুষ ● পরিবেশবিদ্যা পরিচয় ● পরমানু শক্তি নয়-বিকল্প শক্তিই ভরসা ● ভারতের আম আদমির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র : স্মরণ বিস্মরণ ও নির্মাণ : রবীন মজুমদার

পাওয়া যাবে দুহাজার ষোলোর বইমেলায় বি-ও-বির টেবিলে ও অন্যত্র।
বি-ও-বি-তে আপনার মতামত, চিঠিপত্র, লেখা ইত্যাদির জন্য
ডাকযোগে এবং / অথবা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করুন।
প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮ টা, 2/1A, আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা-700009

শ্রদ্ধেয় মণিদাকে যেমন বুঝেছি

বিদ্যুৎ বিশ্বাস

(bidbis@gmail.com)

তাঁরও মনে সর্বক্ষণ অনুরণিত হত, 'মানুষ হইয়া জনম লইয়া মানুষের করিলাম কি?' তবু তিনি মনে করেন নি, গুরুভজনা না ক'রে খুব ভুল করেছেন অথবা ভস্মে ঘী ঢেলেছেন। তিনিও কোন সম্ভাবনাময় মানুষকে দেখতে পেলে ভাবতেন, 'এমন মানবজমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা'। তিনি সেই জমিতে আবাদ করেছেন সাধ্যমত, কিন্তু সে' ক্ষেত্রে ফসল সুরক্ষিত করতে দেবী আরাধনার প্রয়োজন অনুভব করেন নি।

তিনি নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাস করতেন—আস্থা রেখেছিলেন সেই কবিবাক্যে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। তিনি ছিলেন আমাদের মনিদা—ডঃ মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার।

১৯৭২-৭৩ সালে আমি স্নাতক স্তরের ছাত্র। স্থানীয় বিজ্ঞানমনস্ক বন্ধু ও দাদাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর শহরে আমরা একটি বিজ্ঞানসঙ্ঘ গ'ড়ে তুলেছিলাম। সবাই মিলে অনেক পরিশ্রম করে ঐ সঙ্ঘের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলাম। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদারের সঙ্গে সেই আমার প্রথম আলাপ। আমার মত একজন বালখিল্যকে তিনি ভুলে যাবেন, এ'টাই ছিল স্বাভাবিক। সে'টা হল না—কেন না স্নাতক পর্ব সেরে কল্যাণীতেই রাজ্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে ছোট একটা চাকরী পেলাম। সুযোগ পেলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বা মণিদার বাড়ীতে চলে যেতাম—ওঁর যুক্তিবাদী বক্তব্যে ঋদ্ধ হতাম।

ঐ সময় দেশে জরুরী অবস্থা জারী ছিল। আমাদের কণ্ঠ তখন রুদ্ধ, বাঁশী সঙ্গীতহারা। সে'সময়ে মণিদার চারপাশের অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। ওঁর 'সমাজ ও বার্তা' পত্রিকায় অনেক খবর ও প্রবন্ধের সাথে আমার কাঁচা হাতের একটা গল্পও ঠাঁই পেয়েছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের এক আদর্শবাদী ছেলে দুর্মূল্য এক চাকরীর প্রত্যাশায় নিজের মননকে হত্যা করছে—আলো-আঁধারের গল্প, 'মনসিজ'। হয়ত' বস্তু ছিল তা'তে—আবেগে ভেসে কোন লেখা ছাপাবার মত মানুষ তিনি ছিলেন না। চারটি সংখ্যা প্রকাশের পর 'সমাজ ও বার্তা' পত্রিকা প্রগতি বার্তা পাক্ষিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়- যে পত্রিকা মণিদার জীবনের এক দীর্ঘ অধ্যায় রচনা করেছে।

তিনি ছিলেন প্রখর যুক্তিবাদী। প্রশ্ন করতেন, "চার্বাক দর্শন পড়েছো? মানবেন্দ্র নাথ রায়ের 'সায়েন্স অ্যান্ড সুপারস্টিশন'? ডঃ আব্রাহাম থোম্মা কভুরের 'বিগন গডমেন' বা 'গড্স, ডেমনস অ্যান্ড স্পিরিটস'? কালীচরণ ঘোষের 'দ্য রোল অব অনার'? ব্রাট্রান্ড রাসেল বা জে বি এস হ্যাল্ডেন-এর লেখা?" মানুষের ইতিহাস, মানবজীবনে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা জলের মত বুঝিয়ে দিতেন।

তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন, " দেখো, আমরা যারা যুক্তিবাদী অথবা মার্ক্সবাদী দর্শনে বিশ্বাসী তারা অনেক সময়েই একটা অতি-সরলীকরণ ক'রে ফেলি। আমাদের মতাদর্শের বাইরে যাঁরা আছেন, তাঁরা সবাই প্রতিক্রিয়াশীল এবং তাঁরা কেউ ভাল মানুষ নন। আমি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, এ'কথা সবসময় সত্য হয় না"।

মরিচঝাঁপির ঘটনা অন্য অনেকের মত তাঁকেও উদ্বেল করেছিল। ১৯৭৮-৭৯ সালে একটি গল্পে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় আমি লিখেছিলাম, 'রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দাও'। ১৯৭৯ সালেই প্রগতি বার্তার তৃতীয় বর্ষের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যায় 'শব্দবর্ণ' পত্রিকা থেকে গল্পটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। তিন দশক পরে যখন মরিচঝাঁপির ঘটনার পুনর্মূল্যায়ন শুরু হ'ল, তখনও সেই আর্তি তিনি অবিকল মনে রেখেছিলেন।

তাঁর ছিল অগাধ পড়াশোনা। সমাজ, পরিবেশ ও বিজ্ঞান নিয়ে লেখা বিভিন্ন বই পড়তেন, পরিচিত মানুষদের তাঁর ভাল-লাগা বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করতেন। পড়ার দ্রুতিও ছিল ঈর্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের পল্লীবিকাশের ধারণা এবং আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ফলিত বিজ্ঞানের আদর্শ তাঁকে প্রাণিত করেছিল। গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে মেহনতী মানুষের জীবনযাপনের গ্লানি ও পরিবেশের উপর আক্রমণের ঘটনা 'প্রগতি বার্তা' পত্রিকায় প্রকাশ ক'র সাংবাদিকতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন তিনি। ১৯৭৭ সালের ১৬ই নভেম্বর প্রগতি বার্তার প্রথম সংখ্যায় এই পাক্ষিক প্রকাশের চতুর্মুখী উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছিল— গ্রাম ও শহরের শ্রমজীবী জনসাধারণের সংবাদ ও সমস্যা বর্ণনা, ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্পের সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তথ্যনিষ্ঠ বক্তব্য, গঠনমূলক সমালোচনা এবং ভাল কবিতা ও গল্প প্রকাশ। পরবর্তীকালে এই পত্রিকায় অন্তর্তদন্তমূলক তথ্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তিনি ও তাঁর সহযোগীর দল। স্বনামে, 'জয়দেব দাস' ছদ্মনামে বা বেনামে (নিজস্ব সংবাদদাতা, বিশেষ সংবাদদাতা, নিজস্ব প্রতিবেদক ইত্যাদি) 'প্রগতি বার্তা' পত্রিকায় নিজস্ব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ যে সব সংবেদশীল সম্পাদকীয়, সংবাদ ও প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলো অতীত ছাপিয়ে আজও অনেকাংশে প্রাসঙ্গিক। তাঁর সম্পাদকীয় স্তম্ভে, স্বনামে ও জয়দেব দাসের ছদ্মনামে পত্রিকার ঊষালগ্নে প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধের কথা এ'প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে—'উদ্বাস্তু সমস্যা ও ভোটের রাজনীতি' (প্রগতি বার্তা ১৬/০৪/১৯৭৮), 'কামাগাটামারুর শহীদদের কথা' (১৬/০৭/১৯৭৮), 'অশিক্ষা দারিদ্র্যের সহযাত্রী' (০১/০১/১৯৭৯), 'মস্তান অ্যাকাডেমিসিয়ান ও বিপন্ন জ্ঞানচর্চা' (১৬/০৩/১৯৭৯), 'পাওয়ারলুম ও তাঁর শ্রমিকদের বাঁচার লড়াই' (১৬/০৪/১৯৭৯), 'মাউন্টব্যাটেনের মৃত্যু ও স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রীয় শোক' (০১/০৯/১৯৭৯), 'প্রতিক্রিয়াশীলতা, বামফ্রন্ট ও প্রগতি বার্তা' (০১/০৯/১৯৭৯), 'কল্যাণী বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলন' (০১/১০/১৯৮০), 'জ্যোতিষ, সমাজ ও বিজ্ঞান' (১৬/১০/১৯৮০), 'জনচিকিৎসার ডিপ্লোমা কোর্স : একটি জনমুখী প্রয়াস' (০১/০১/১৯৮১), মুনাফাসন্ধানী বড় দৈনিক : বামফ্রন্ট : ক্ষুদ্র পত্রিকা' (০১/০২/১৯৮১), 'কুসংস্কার : স্বরূপ ও উৎস' (০১/১১/১৯৮১), 'রাষ্ট্র ও মানবাধিকার' (১৬/১২/১৯৮১), 'মৎস্যজীবীদের বিড়ম্বনা' (০১/০১/১৯৮২), 'এশিয়াডের অপর দিক' (১৬/১২/১৯৮২), 'শতাব্দীর বিবর্তন : কার্ল মার্ক্স থেকে আজকের বামফ্রন্ট' (১৬/০৩/১৯৮৩), 'বাঁচতে শেখার আন্দোলন' (১৬/০৪/১৯৮৩), 'অলৌকিক জগৎ ও লোকসমাজ / অতিপ্রাকৃত চর্চা : প্রাচীন ও সর্বব্যাপী' (০১/০৯/১৯৮৩), 'জনবিজ্ঞান ও ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞান' (০১ ও ১৬/১০/১৯৮৩) ইত্যাদি। প্রথম থেকেই তিনি এই পত্রিকায় কলম ধরেছেন লোকায়ত সংস্কৃতির পক্ষে অথচ যাবতীয় কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার বিপক্ষে, শ্রমজীবী মানুষদের পক্ষে ও যাবতীয় ঔপনিবেশিক ও ধনতান্ত্রিক শোষণের বিপক্ষে, সুস্থ পরিবেশের পক্ষে ও পরিবেশ-বিনাশী উন্নয়ন প্রয়াসের বিপক্ষে। তিনি তাই নগ্নপদ চিকিৎসার ডিপ্লোমা প্রবর্তনকে বা নিম্ন শ্রেণী থেকে ইংরেজী শিক্ষার অবসানকে স্বাগত জানান, 'নর্মদা বাঁচাও' বা 'চিপকো' আন্দোলনে উৎসাহিত হন, বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক স্বার্থের চেয়ে মালিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিলে ক্ষুব্ধ হন, আবার কৃষকের জমির অধিকার বিপন্ন মনে করলে সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তিনি খুঁজে পান নি—তাই এ'বিষয়ে কলম ধরতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী', 'উৎসমানুষ', 'ফ্রন্টিয়ার' এবং নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে।

আর্সেনিক, ফ্লোরাইড ও অন্যান্য রাসায়নিক দূষণের বিরুদ্ধে তাঁর আমরণ সংগ্রাম বাংলার বিজ্ঞান আন্দোলনের এক উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকেব। মানব কল্যাণে অধীত রসায়নবিদ্যার ফলিত প্রয়োগ তিনি করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি স্থাপন করেন আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড সোসাইটি।

মণিদা অজাতশত্রু ছিলেন না, অজাতশত্রু হওয়ার বাসনাও বুঝি তাঁর ছিল না। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে নিজের অভিমত যুক্তি দিয়ে বিপক্ষকে বোঝাতে চাইতেন— বিপক্ষ

যুক্তিতে সারবত্তা থাকলে নিজের পূর্বসিদ্ধান্ত সংশোধন করতেনও রাজী ছিলেন। কিন্তু ভয় পেয়ে নিজের অবস্থান থেকে পেছিয়ে আসেন নি কখনো।

আমি বিজ্ঞানী নই, নিজেকে বিজ্ঞানের সেবক ভাবার স্পর্ধাও আমার নেই। মণিদার উদ্যোগে আমি পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা এবং উৎস মানুষের মত প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। আমি যেন 'হংসোমধ্যে বকো যথা'—এমন হীনমন্যতাও মাঝে মাঝে আমাকে পেয়ে বসত। মণিদার একাধিক স্মরণসভায় গিয়ে উপলব্ধি করেছি, আমার মত বেশ কিছু অপাক্তেয়কে তিনি পঙ্‌ক্তি-ভোজনের সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন—যাঁরা মনে করতেন, 'তিনি আমাদেরই লোক'।

চাকরী থেকে অবসর নিয়েছি কিছু দিন আগে। ড: ব্রহ্মদেব শর্মার 'দুই জাতির গল্প' এবং আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে অনেক কিছু করার কথা ছিল, যার মধ্যে কিছু অকর গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের কথাও তিনি ভেবেছিলেন। তাঁর গতির সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে আমি পেছিয়ে গেলাম। তিনি উল্কার বেগে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেলেন।

আমার কাছে এ' এক অপূরণীয় শূন্যতা।

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র (কলেজস্ট্রিট), পাভলভ মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার (মহাত্মা গান্ধী রোড), অমর কোলের স্টল (বিবাদী বাগ), অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনের বিভিন্ন বই-এর স্টল

গ্রাহক চাঁদা— 150 টাকা (ডাকখরচ সহ) কলকাতার বাইরে চেকের জন্য অতিরিক্ত 30 টাকা

পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন : 9830922194 বা 9331012567

জনবিজ্ঞানী ও সমাজচিন্তার দিশারি
অধ্যাপক মনীন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের
অসম্পূর্ণ রচনা-তালিকা

দীপক কুমার দাঁ

(dipakdan@gmail.com)

[মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদারের রচনা-সংকলন তৈরী ও প্রকাশের ভাবনা মাথায় রেখে শ্রী দাঁ এই তালিকাটি তৈরী করেছেন। অসম্পূর্ণ এবং খানিকটা অগোছালো হওয়া সত্ত্বেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সবাই মিলে একে গুছিয়ে সম্পূর্ণ করে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন শ্রী দাঁ। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও একই আবেদন জানাই। আরও কিছু পত্র পত্রিকা-সংবাদপত্রে মণিদার লেখা ছড়িয়ে আছে। ইংরেজি লেখা তো এখানে ধরাই হয় নি। —স. ম.]

১৯৭০-২০১০—কমবেশি চার দশক সক্রিয় থেকেছে এই মানুষটির বিবিধ কর্মকাণ্ড জনবিজ্ঞান চর্চার বিবিধ বিস্তৃত পরিধিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে (কল্যাণী) রসায়ন পঠনপাঠন ও গবেষণার প্রথামাফিক ব্যস্ততার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান সচেতনতার ও যুক্তিবাদী বিজ্ঞনমনস্ক জীবন প্রয়াস গড়ে তোলায় তাঁর আন্তরিক উদ্যোগক এক বিরল নজির হিসাবে চিহ্নিত হবে।

শুরুটা সম্ভবত 'প্রগতিবার্তা' পত্রিকার (প্রথমে সম্পাদক — এম এন মজুমদার নিজেই) অমূল্য মণ্ডল (ছাত্র) মহাশয়ের মাধ্যমে। আটপৌরে ভাষায় সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের খবরাখবর পৌঁছে দেওয়ায় তাঁর নিবেদিত ঐকান্তিক প্রয়াস ব্যতিক্রমী ভাবনা হিসাবে চিহ্নিত হবে। ১৯৮০ ফেব্রুয়ারি সূর্যগ্রহণের দিনে রাজ্য সরকার ছুটি ঘোষণা করে। ৯৯ শতাংশ দেশবাসী ঘর-জানলা-দরজা বন্ধ করে ঘরে আবদ্ধ ছিল। সকাল দশটায় রাস্তাঘাট শুনশান। এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় লেখালেখি ও জনচেতনা বাড়াতে সভাসমিতি করেছিলেন নানা স্থানে। 'বিজ্ঞান সূর্যগ্রহণ ও পুণ্যসঞ্চয়'—এক বিশিষ্ট প্রতিবাদী রচনা হিসাবে চিহ্নিত আছে।

সমাজের বিবিধ কুসংস্কার দূরীকরণে তাঁর নিরন্তর প্রয়াস আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জ্যোতিষচর্চা যে আদতে একটি কুসংস্কার ও অর্থ রোজগারের ধান্দা, তা তিনি বারে বারে লিখে, সভাসমিতিতে বক্তৃতা করে জনমত জাগ্রত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। পারমানবিক বোমা ও বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের তাণ্ডবের বিরুদ্ধে মানব মুক্তি ও শান্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর লেখনী চিরদিন সজাগ থেকেছে।

(১) বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রাজনীতিতে হিংসা ও অহিংসা, (২) পরমাণু তুমি কার? বিজ্ঞানের না ব্যবসার? ইত্যাদি—তার সাক্ষ্য বহন করে।

বিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চা যে বাঙালির বিজ্ঞান সংস্কৃতি গড়ায় অপরিহার্য, তা তিনি বারে বারে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। (১) আধুনিক বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও উৎস সন্ধানে (নীডহ্যাম), (২) ইতিহাস, বিজ্ঞান ও বাঙালি সংস্কৃতি বিষয়ে, (৩) বিজ্ঞান ইতিহাসের ভূমিকা—ইত্যাদি তার নিদর্শন।

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'-তে তিনি নিয়মিত লিখেছেন গোড়া থেকেই। পরে উৎস মানুষ' পত্রিকা ঘিরে গড়ে ওঠা জনবিজ্ঞান আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় থেকেছেন শুরু থেকেই। 'হোমিওপ্যাথি' যে আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্র সমর্থিত নয়, তা তিনি দীর্ঘ গবেষণামূলক নিবন্ধে একাধিকবার তুলে ধরেছেন। পরিবেশ চর্চার আঙিনায় তাঁর ছিল সতর্ক প্রহরা। আর্সেনিক, ফ্লুরাইড, কৃষিতে বিষ ব্যবহার ইত্যাদি

নিয়ে তাঁর লেখনী সদা জাগ্রত থেকেছে। এসব নিয়ে তাঁর একাধিক বইও আছে জনবিজ্ঞানের আঙিনায়।

জনবিজ্ঞান চর্চা ও ভাবনায় তিনি সারাটা জীবন অতিবাহিত করেছেন এক সারস্বত ভাবুক হিসাবে। কম খরচে বা বিনা খরচে গরিব মানুষের সুচিকিৎসায় তাঁর নানা প্রয়াস অব্যাহত থেকেছে মৃত্যু অবধি। খরা বন্যা ও ভারতীয় জীবনের নানা দৈনন্দিন সংকটে তিনি সর্বদাই অত্যাচারিতের পাশে থেকেছেন মানবিক মমতায়। সাধ্যমত বন্ধুত্বের পরশে। পশ্চিমবঙ্গের গুটিকয় মানবতাবাদী ও সমাজদিশারিদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

জনবিজ্ঞানী অধ্যাপক মনীন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের লিখিত প্রবন্ধ সংগ্রহ (বাংলা)

(ক) জনবিজ্ঞানমূলক (যুক্তিবাদী—বিজ্ঞানমনস্ক—সমাজ পরিবর্তন মূলক ভাবনা)

১. বিজ্ঞান, সূর্যগ্রহণ ও পুণ্যসঞ্চয়—প্রগতিবার্তা, ০৮/০২/১৯৮০, পৃ. ১-২।

২. বিজ্ঞানের তলোয়ার থেকে জনবিজ্ঞানের লাঙল-মাইল কুলি (অনুবাদ) প্রগতিবার্তা, ১৬/১০/১৯৮০, পৃ. ১২৪-৩২ লাঙল-মাইক কুলি (অনুবাদ)—

৩. ভর, দিব্যদৃষ্টি ও কামদেবপুর রহস্য—উৎস মানুষ, জানুয়ারি ১৯৮৪।

৪. তরোয়াল থেকে কাস্তে, লিউকাস এয়ারোস্পেসের অভিজ্ঞতা, বি ও বি, মে-আগস্ট ১৯৮৫

৫. বিজ্ঞান ইতিহাসের ভূমিকা — বিওবি, জানু-ফেব্রু:, ১৯৭৮, পৃ. ২-৯ *চিঠিপত্র: জুলাই-আগস্ট ১৯৭৮, পৃ. ১৯-২০।

৬. জ্যোতিষশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও মানবসমাজ-উৎস মানুষ, অক্টো-নভ: ১৯৮২, পৃ. ১০-১৩।

৭. গঙ্গাজলের অলৌকিক মাহাত্ম্য—প্রগতিবার্তা—০৮/০২/১৯৮০,—ড. আব্রাহাম টি কভুর। অনুবাদ: পৃ: ১/৩-৪।

৮. জন্মান্তর, অদৃষ্টবাদ ও বিজ্ঞান—প্রগতিবার্তা, ১৬/০৯/১৯৭৯, পৃ. ৮, ১০-১২।

৯. স্বর্গীয় বেদনা ও সমবেদী ক্ষতচিহ্ন—(চিঠিপত্র)—উৎস মানুষ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮২, পৃ. ১৯-২২।

১০. বিজ্ঞান ও ভারতের গণজাগরণ—প্রগতিবার্তা, ০১/০৯/১৯৭৯, পৃ. ৩-৪।

১১. আধুনিক বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও উৎস সন্ধানে—বিওবি, অক্টোবর-ডিসে: ১৯৯৭ পৃ,১৭-১৮। বিজ্ঞানী জোসেফ নীডহ্যাম, (Book Review),

১২. বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রাজনীতিতে হিংসা ও অহিংসা-বিওবি, জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০১০, পৃ. ২৪-৩২।

১৩. উচ্চশিক্ষার নিম্নভাবনা—উৎস মানুষ, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ১৯-২২।

১৪. নোবেল শান্তি পুরস্কার—দু'হাজার চার. বি ও বি. জানু—ডিসে: ২০০৪

১৫. ইতিহাস, বিজ্ঞান ও বাঙালি সংস্কৃতি বিষয়ে। (Book Review)

১৬. চ্যান্সেলারস্ অব ভাইস ও অন্যান্য, বিওবি, এপ্রিল-জুন ১৯৯৮, পৃ. ২১-২৪। (Book Review)

১৭. সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত অবশেষ।

১৮. প্রফুল্লচন্দ্র আজও কেন প্রাসঙ্গিক-উৎস মানুষ, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ২৩-২৫।

১৯. চিঠিপত্র : ডারউইন তত্ত্ব বিষয়ে

২০. সমাজ, সংবাদ ও সাংবাদিক—প্রগতিবার্তা, ১-১৬ জুন ১৯৭৯, পৃ. ৭-১০।

২১. আগুন, ভক্তি, ভেলকি—উৎস মানুষ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮১, পৃ. ৩১-৩৫।

২২. আগুন সন্ন্যাসীর গোপন মন্ত্র

২৩. ইতিহাসে বিজ্ঞান ও বাঙালি সংস্কৃতি বিষয়ে আশিস লাহিড়ী, বিওবি, জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ. ৮৩-৮৫।

(খ) পরিবেশ চিন্তা ও জনস্বাস্থ্য ভাবনা

১. বাংলার নদনদীর গতিপ্রকৃতি ও পরিবেশের উপর বন্যার সুপ্রভাব—বিওবি, জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ২-৮।

২. বনাঞ্চল হ্রাস খরা ও বন্যার প্রকোপ বাড়ায়—প্রগতিবার্তা, ১৬/০৮/১৯৮০।

৩. অবহেলিত পরিবেশবাদী সত্যদ্রষ্টা স্যার উইলিয়াম উইলসন-টপ কোয়ার্ক, জুন-নভেম্বর, ২০০৪, পৃ. ৫৫-৫৮।

৪. খরা—উনিশশো বিরাশি ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা—বিওবি, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৮২, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, পৃ. ২-৫। (সহলেখক: রবীন চক্রবর্তী)

৫. চক্রান্ত : প্রাকৃতিক না মানবিক-প্রগতিবার্তা ১৬/০৭/১৯৭৯, পৃ. ১৩৩।
৬. স্টকহোম ঘোষণাপত্র—বিওবি, মে-জুন ১৯৮৩, পৃ. ৩-৫। (সহলেখক: স্বপন শীল)
৭. মাসানোবু ফুকুওকা—বিওবি, মে-জুন ১৯৮৮, পৃ. ১-৪।
৮. মানোবু ফুকুওকা ও প্রাকৃতিক ক্ষেতির স্বপক্ষে—উৎস মানুষ, অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৮৮, পৃ. ৩০৬-০৭।
৯. পেস্টিসাইডের অপপ্রয়োগ ও আমাদের ভবিষ্যৎ (১) বিওবি, জুলাই-আগস্ট ১৯৮০, পৃ. ৩-৬। ঐ (২) বি ও বি, সেপ্টে-অক্টো-১৯৮০।
১০. বিজ্ঞান কর্মীদের সামনে চ্যালেঞ্জ : আর্সেনিক মুক্ত স্বাস্থ্যকর ভূগর্ভ জলোত্তোলনের সস্তা ও সুপরিবেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বিওবি, জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ৪১-৪৩।
১১. আর্সেনিকের বিষক্রিয়া চলছেই—পরিপ্রশ্ন, ফেব্রুয়ারী ২০০৯, পৃ. ৬২-৬৬।
১২. ফ্লোরাইড বিষক্রিয়ার তাণ্ডব এখন পশ্চিমবঙ্গেও—বিওবি, জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০০৭-৮, পৃ. ৩৩-৪০।
১৩. বাঁকুড়ার গ্রামে আমাদের হাসপাতাল ও সাম্প্রতিক কিউবার কৃষি ও চিকিৎসাশিক্ষার বৈপ্লবিক সাফল্য, বিওবি, জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ৬৫-৬৮।
১৪. হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত? বিওবি, জুলাই-আগস্ট ১৯৮১, পৃ. ২-৪।
১৫. হোমিওপ্যাথির সমাপ্তি—উৎস মানুষ, সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ. ২৩-২৭।
১৬. প্রতিবাদের উত্তর ও হোমিও প্রসঙ্গে আরও কিছু—বিওবি, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী. ১৯৮২, পৃ. ৯-১৪।
১৭. শব থেকে সম্পদ—প্রগতিবার্তা, ১৬/০৮/১৯৭৯, পৃ. ১, ৩-৪।
১৮. অবহেলিত খাদির শব সম্পদ কেন্দ্র, প্রগতিবার্তা, ৩০/০৭/১৯৭৯, পৃ. ১
১৯. রূপকথা নয়, এ দেশেরই কথা—প্রগতিবার্তা, ১৬/০৫/১৯৮০, পৃ. ৪-৬।
২০. পরমাণু তুমি কার? বিজ্ঞানের না ব্যবসার—বিওবি, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৮৭।
২১. স্কটহোম ঘোষণাপত্র: মানব পরিবেশ সুরক্ষার দায়িত্ব ও অধিকার—বিওবি, মে-জুন ১৯৯০, পৃ. ১৯-২১।
২২. পরিবেশ: পরিবহন ও মানুষ—বিওবি, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ১১-১৫।
২৩. স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষা: এদেশ ওদেশ—বিওবি, জানুয়ারী-এপ্রিল, ১৯৯১, পৃ. ৮-৯।
২৪. বিশেষ রচনা— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল অ্যান্ড এনভায়রণমেন্টাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ—বিওবি, জানুয়ারী-ডিসেম্বর-২০১৩, পৃ. ৪২-৪৫।
২৫. প্রসঙ্গ: বিজ্ঞানবাদী কুসংস্কার না কুসংস্কারবাদী বিজ্ঞান—উৎস মানুষ, মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৭৯-৮২।
২৬. বিজ্ঞান না গণবিজ্ঞান (বিতর্ক)—উৎস মানুষ, এপ্রিল ১৯৮৯, পৃ. ৯৮-৯৯।
২৭. হিন্দু পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম: চাই উপযুক্ত সংস্কার—উৎস মানুষ, জুন ১৯৮৮, পৃ. ১৫২-৫৪।
২৮. বিকল্প নোবেল পুরস্কার—উৎস মানুষ, জানুয়ারী ১৯৮৮, পৃ. ৫-৭।
২৯. না-বলা অনেক কথা থেকে গেল—উৎস মানুষ, জানুয়ারী ২০০৯, পৃ.১৬-১৭।
৩০. বিজ্ঞান সংস্কৃতি ও উপকথায় মণিরত্ন-এক ও দুই—অন্বেষা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪, পৃ. ১-৭ ও মার্চ ১৯৮৪, পৃ. ১৭-২২।

(গ) বিবিধ

১. বিওবি-র অর্জন ও সম্ভাবনায় দিশা নির্দেশে কিছু কথা—বিওবি, জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ. ৫৩-৫৪।
২. আবহ পরিবর্তন: আসন্ন সংকটের স্বরূপ সন্ধানে—পরিবেশ-২০০৯ (স্মারক সংখ্যা)

পুস্তিকা

১. কল্যাণী ঘোষপাড়ার সতীমার মেলা ও কর্তাভজা সম্প্রদায় (কাঁচড়াপাড়া বিজ্ঞান দরবার প্রকাশিত)
২. গণবিজ্ঞান আন্দোলন কী ও কেন, একটি প্রাথমিক খসড়া (অমূল্য মণ্ডল, কল্যাণী থেকে প্রকাশিত), ১৯৮২
৩. বাংলায় আর্সেনিক—প্রকৃতি ও প্রতিকার—ভাষাপ্রকাশ, সোনারপুর, কলকাতা।
৪. পরিবেশবিদ্যা পরিচয় (সহলেখক: রবীন্দ্রনাথ মজুমদার) ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কো.। ২০০২
৫. ফ্লুরাইড বিষণ : একটি স্বাস্থ্যভূতাত্ত্বিক আলোচনা, দিশা (কলকাতা), ২০১১।
৬. পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড—ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নিউ দিল্লী, ২০১৪, ২১৫ টাকা, ২৩৪ পৃ.

স্মরণ

আমার শিক্ষক বিনায়ক দত্তরায়

সুদীপ্ত সরস্বতী
(sudipta_saraswati@yahoo.com)

[অধ্যাপক বিনায়ক দত্তরায় (আমাদের বিনয়কদা) সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বিজ্ঞনী ছিলেন। সেখানে পোস্ট এম.এস.সি ছাত্রদের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান পড়াতেন, গবেষণার গাইড তো ছিলেনই। এ ছাড়াও তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আমেরিকার নিউ-জার্সির স্টিভেনস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অতিথি অধ্যাপক ছিলেন। কানাডা এবং রাশিয়াতেও তিনি পড়িয়েছেন। তরুণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ অনুপ্রেরণা। তাঁর লিখিত Elements of Quantum Mechanire দেশে ও বিদেশে সমাদৃত।

১৯৭৬-৭৭-এ আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা এবং 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার সূচনালগ্নে বিনায়কদা ছিলেন একজন অন্যতম উদ্যোক্তা ও কর্মী। গবেষণাগারের অগণতান্ত্রিকতা, তরুণ গবেষকদের অসহায়তা এবং বিজ্ঞানী ও কর্মীদেব সঙ্গে কর্তৃপক্ষের প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের বিরুদ্ধে তিনি সেই সময় গর্জে উঠেছিলেন —স.ম.]

বিনায়ক দত্তরায় (জন্ম: ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬, বারলউগঞ্জে, মুসৌরির কাছে। মৃত্যু: ৪ঠা অক্টোবর, ২০১৫, কলকাতা পাটুলির বাড়িতে) আর নেই।

খুব অল্প সময়ের জন্য তাঁর ছাত্র হওয়ার সুবাদে এক সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত শিক্ষণপদ্ধতির মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার, সেই সদ্য যৌবনের অভিজ্ঞতার ও শিক্ষাপদ্ধতির পূর্ণ মূল্য তখন পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি, জীবনের অগ্রগতির সাথে সাথে তার অনন্য হীরকদ্যুতি অনেক বেশি উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমার নিজের শিক্ষক-জীবনের শুরুতে সেই রহস্যের খোঁজ পেতে আমাকে আবার ছাত্র হিসেবে ফিরে যেতে হয়েছে তাঁর কাছে।

ফিজিওলজিতে স্নাতক পর্বের পড়াশোনাটা শেষ করে আমি পরের পর্বে হঠাৎই উঠে পড়লাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে বছরই নতুন চালু হওয়া বায়োফিজিক্সের নৌকায়, বায়োলজিটা অল্পস্বল্প বুঝতে শুরু করেছি। কিন্তু ফিজিক্স বস্তুটা তখন আমার কাছে গ্রীক না হলেও অন্তত ফ্রেঞ্চ তায় আবার কোয়ান্টাম মেকানিক্স? রাজাবাজার সাইন্স কলেজে সেই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ক্লাসে প্রথম দেখলাম বিনায়ক দত্তরায়কে।

এবারে পটভূমিকাটা একটু বিশদে আঁকা দরকার।

উনিশশো সাতাশি সালে আমাদের বি.এস.সি-র রেজাল্ট বেরোলো। ঘটনাচক্রে সে বছরই অধ্যাপক রমেন পোদ্দারের উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োফিজিক্স অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজির এম.এস.সি কোর্স চালু হোলো, সেসময় এমন একটা নতুন ধরনের কোর্সে যোগ দেওয়ায় আকাঙ্ক্ষা যেমন ছিল, আবার শঙ্কাও ছিল।

মলিকিউলার বায়োলজি বিষয়টা নিয়ে পড়ার তীব্র আকর্ষণ ছিল। কিন্তু সমস্যা হলো বায়োফিজিক্স বিষয়টাকে কেন্দ্র করে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন বায়োফিজিসিস্টদের সম্পর্কে একটা রসিকতা চালু ছিল: "যারা বায়োলজিস্টদের কাছে ফিজিক্সের ফান্ডা লড়ায় আর ফিজিসিস্টদের কাছে বায়োলজির ফান্ডা দিয়ে বাহবা আশা করে, তারাই বায়োফিজিসিস্ট।"

রসিকতা যাই চালু থাকুক, আমি তখন মনে করতাম, বায়োফিজিক্স হচ্ছে আসলে ফিজিসিস্টের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বায়োলজির বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা। কিন্তু মনে হচ্ছিল, সেক্ষেত্রে বায়োলজির পাশাপাশি ফিজিক্সেও তো দখল থাকতে হবে। এদিকে ফিজিক্স নিয়ে আমার পড়াশোনার দৌড় হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্তই। আবার হায়ার সেকেন্ডারিতেও আমার ফিজিক্সে পারদর্শিতা মোটেই লোক ডেকে বলবার মতো ছিল না। ফলে বায়োফিজিক্স অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজিতে এম.এস.সি পড়ার সুযোগ পেলেও তা আদৌ সুখের হবে কি না, তা নিয়ে একটা টানাপোড়েন ছিলই।

একদিকে জীবনবিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণার অঙ্গনে ঢোকার প্রবেশপথ হিসেবে মলিকিউলার বায়োলজি নিয়ে পড়ার আকর্ষণ। অন্যদিকে পদার্থবিজ্ঞানে আমাদের দৌড় যতটুকু, তা সম্বল করে বায়োফিজিক্স পড়ার ব্যাপারে

একটা দ্বিধাবোধ, এমন এক দ্বন্দ্ববিধুর সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক প্রয়াত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের (এইচ.পি.সি.) সঙ্গে কথা হলো। কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে তিনি আমার সঙ্গে বায়োফিজিক্স এবং মলিকিউলার বায়োলজির নানা দিক নিয়ে আলোচনা করলেন। সেই কথোপকথনের স্মৃতি আমার মনে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। ভবিষ্যতে নিউরোবায়োলজি নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছে আমার ছিলই। বায়োফিজিক্স অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজি নিয়ে পড়ালে গবেষণার কাজে যে অনেক বেশি উপকৃত হবো, তা উপলব্ধি করলাম। এইচ.পি.সি.-র সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার শেষে বায়োফিজিক্স নিয়ে পড়ার ব্যাপারে আমার দ্বিধা কেটে গেল। ওই বিষয়ে এম.এস.সি পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। সেটা আমার জীবনে একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল।

বায়োফিজিক্স পড়তে এসে দেখলাম, সিলেবাসে "কোয়ান্টাম মেকানিক্স" নামে একটা বিষয় রয়েছে। ফিজিক্স নিয়ে পড়া বন্ধুদের সেকথা বলতেই ওরা বলে উঠল, "তোরা বায়োলজির ছাত্রছাত্রীরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বুঝবিটা কী? বিষয়টা বোঝার জন্যে জটিল ম্যাথমেটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার হয়। তোদের তা নেই। এমনকি ফিজিক্সের ছাত্রছাত্রীরাও বিষয়টা নিয়ে হিমশিম খায়।"

শুনে তো আমার অবস্থা কাহিল। ক্লাসের রুটিন অনুসারে একসময় কোয়ান্টাম মেকানিক্স পড়াতে এলেন অধ্যাপক বিনায়ক দত্তরায়। তিনি ছাত্রছাত্রীদের কাছে বি.ডি.আর. নামে পরিচিত ছিলেন। শুনলাম, তিনি একজন প্রখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী। কোয়ান্টাম মেকানিক্স বিষয়ে যত আশঙ্কা ও উদ্বেগ নিয়ে ক্লাসে ঢুকেছিলাম, বি.ডি.আর. এর প্রথম ক্লাসেই তা যেন উবে গেল। জীববিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে কোনোরকম গাণিতিক জটিলতার মধ্যে না গিয়ে অত্যন্ত সহজভাবে—কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জন্ম—কিভাবে তা প্রচলিত চিন্তাভাবনাকে বদলে দিল—সর্বোপরি জীববিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার দরকারটা কী—এসব বিষয় নিয়ে তিনি আমাদের ক্লাসের পর ক্লাস পড়িয়েছিলেন। সেই ক্লাসগুলোর ছাত্র হিসেবে অংশগ্রহণ করাটা আমার কাছে আজও একটা অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

পরবর্তী জীবনে এমন সমস্ত জায়গায় থেকেছি, গবেষণা ও পড়াশোনা করেছি, যেখানে পৃথিবীবিখ্যাত বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের কোনো অভাব ছিল না। তাঁদের অনেকের ক্লাসেই হাজির থাকার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝেছি, পাণ্ডিত্য ও ভালো শিক্ষকতা সাধারণত হাত ধরাধরি ক'রে চলে না। বি.ডি.আর. এ দুটোকে মেলাতে পেরেছিলেন।

মাঝে একটা দীর্ঘ সময় মূলতঃ ভৌগোলিক কারণে বি.ডি.আর.—এর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, তাঁর ওই পড়াবার অভিনব পদ্ধতির গুরুত্ব তত বেশি বেশি ক'রে বুঝে উঠতে শুরু করলাম। মনে একটা কৌতূহলও তৈরি হলো। কিভাবে তিনি শিক্ষক হিসেবে একজন জীবন্ত কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিলেন। আমার এখন মনে হয়, বি.ডি.আর.-এর সেই দুর্লভ ক্লাস লেকচারগুলো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটা বর্ণপরিচয় হিসেবে প্রকাশিত হ'লে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তা একটা অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকতো।

দীর্ঘদিন পরে যখন সুযোগ পেলাম, বি.ডি.আর.-এর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ি চলে গেলাম। তারিখটা ছিল ২২শে জুন, ২০১৫। দীর্ঘ আলাপচারিতার কোনো এক ফাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলাম, তাঁর এই অসাধারণ শিক্ষণপদ্ধতির মূল রহস্যটা কী। সাধারণভাবে একজন মিথ হয়ে ওঠা ব্যক্তি তাঁর সেই রহস্য-আবরণ ভাঙতে চাননা। বি.ডি.আর. সেই উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রমী শিক্ষকদের একজন যিনি অনায়াসে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রের সামনে একটু একটু ক'রে সেই রহস্যের প্রায় গোটাটাই প্রকাশ ক'রে দিলেন। আমার সৌভাগ্য, আমি গোটাটাই নোট ক'রে নিয়েছি।

অতি দুরূহ বলে ছাত্রসমাজে পরিচিত বিষয়ও যে কত সহজভাবে পড়ানো সম্ভব, বিনায়ক দত্তরায়ের ক্লাসে তা অনুভব করেছিলাম। আর আমার শিক্ষকজীবনের শুরুতে তাঁর সঙ্গে কথা বলে সেদিন তাঁর অসাধারণ শিক্ষকতার রহস্যের খানিকটা অনুধাবন করেছিলাম। এই দুই অভিজ্ঞতা আমার নিজের শিক্ষকজীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে।

(লেখাটিতে "যাত্রাশুরুর সেই দিনগুলি: কিছু টুকরো টুকরো স্মৃতি" নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োফিজিক্স বিভাগের পুনর্মিলন উপলক্ষ্যে বেরোনো একটি স্মরণিকায় ২০১৩-তে প্রকাশিত আমারই একটি লেখা থেকে কিছু অংশ ব্যবহার করেছি।)

অন্যান্য

ফিরে দেখা খবরে পরিবেশের বিপন্নতা

পামেলা মুখোপাধ্যায়

(ifhec08@yahoo.co.in)

শিক্ষা, বিজ্ঞান যতই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে সভ্যতার শিখরে, তার অপব্যবহারে ততই আমরা হয়ে উঠছি অ-সভ্য, উন্নতির বিপরীতে নিয়ে যাচ্ছি জীবনকে; যন্ত্রের যন্ত্রনাময় ব্যবহারে অসহায় করে তুলছি নিজেদের। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের কল্প-গল্প আজ (প্রায়) বাস্তব হয়ে উঠেছে।

কিন্তু লালকমল ঘুমালেও নীলকমল তো জেগে আছে—রাক্ষস আসার খবর দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে সব লাল কমলকে—বেঁচে থাকতে হবে আমাদের, বাঁচিয়ে রাখতে হবে সুন্দর সজীব সপ্রাণ সবুজ 'পৃথিবী' গ্রহকে। আমাদের বুদ্ধি কর্মক্ষমতা ভালবাসা দিয়ে রক্ষা করব পৃথিবীকে—এ আমাদের অঙ্গীকার।

সংবাদপত্রগুলি তাদের দায়িত্বে সেইসব সংবাদ কিছু কিছু আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়। কোথায়, কেন, কি ক্ষতি হচ্ছে, কি ভুল হচ্ছে, ফলাফল কি মারাত্মক হতে পারে—সবই আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে। (অবশ্য অনেক খবরই থাকে তাদের ধরাছোঁয়ারও বাইরে)। সেই খান থেকে নির্দিষ্ট প্রকৃতি পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত সংবাদ গত চার বছর ধরে লিপিবদ্ধ করে, তার ফলাফল অচিরে আমাদের কি ক্ষতি আনতে পারে জানিয়ে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা—"জাগো লাল কমল"। অবশ্য এখানে শুধু জীববৈচিত্র্য নিয়েই আলোচনা করছি। মোটামুটি তিনটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয় মনে হয়েছে :

(১) বিপন্ন জীববৈচিত্র্য

(২) বাংলা/ভারতবর্ষ জুড়ে দেখতে পাওয়া গেছে যে সব পাখী/প্রাণী

(৩) কোন কোন প্রাণীর স্বাভাবিক আচরণ বহির্ভূত ব্যবহার, বিশেষভাবে ভাবায়..

ফিরে দেখা এই সংবাদ বা তথ্য লেখার সময় প্রথম যে খবরটি মনে পড়ে, তা হল—

"বাংলায় জীববৈচিত্র্য চেনাতে শহরের তৈরী হচ্ছে একটি নতুন পার্ক"। খুবই ভাল উদ্যোগ। কিন্তু সেটা কি এই জন্যেই যে, পশ্চিমবঙ্গে কোনো গাছ থাকবে না, পুকুর-জলা থাকবে না, অথবা সেগুলো যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হবে না! তাই কি শেষপর্যন্ত পার্কে গিয়ে আমাদের জীববৈচিত্র্য দেখে আসতে হবে?

২০১০ থেকে ২০১৫ তে লাগাতার একটি বাংলা সংবাদপত্রে বিপন্ন জৈব প্রজাতির হদিস মেলে :

পাখি ঃ হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছি ঝিলে পাখী কম আসছে; যেখানে প্রায় ৪০ (চল্লিশ)-টি প্রজাতির পাখী আসে। কিন্তু ঝিল অত্যধিক নোংরা থাকায়, পাখি কম আসছে এখানে। নভেম্বর ২০১৩-তে প্রকাশিত আর একটি ছবি থেকে জানা যায়, পুরুলিয়া জেলার 'সাহিব বাঁধ'-এ অত্যধিক পানা জমে থাকায়, তখনও পাখি আসেনি। এতো গেল পাখি না আসার খবর।

এরপর নজরে আসে, মারাত্মক গরমে তৃষ্ণার্ত পাখিদের কথা—পুকুর, জলা, শুকিয়ে যাওয়ায়, একটু জলের জন্যে, মুখ হাঁ করে অসহায়ভাবে তারা ঘুরে বেড়ায়—এরকম একটি খবরে নড়ে বসেছিল মুম্বাই থেকে কলকাতা। একটি এস এম এস-এর আবেদনে সাড়া দিয়ে সেদিন থেকে গোটা গরমে মানুষেরা মানুষের কাজ করেছিল, জল রেখেছিল জানালায়, বাইরের বারান্দায় বা খোলা ছাদে। অনেক পাখি বেঁচে গিয়েছিল।

হাতি : এই বিশাল প্রাণীটির উপরে কিভাবে মর্মান্তিক মৃত্যু নেমে আসছে এবং বিপন্ন হয়ে পড়ছে এই প্রজাতিটি তা প্রকাশিত সংবাদগুলিতে নজর রাখলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

"বিষ জল খেয়ে হাতির মৃত্যু"

এছাড়াও চা-বাগানের জলে হস্তী-শাবক পড়ে গেছে জল খেতে গিয়ে। অথবা বড় হাতি পড়ে গেছে জলে নেমে, উত্তরবঙ্গ সেনাবাহিনীর লোকেরা দড়ি দিয়ে চেষ্টা করছে হাতিটিকে তুলতে। এছাড়া দাঁতের জন্যেও চোরাগোপ্তা

হানায় মৃত্যু হয়েছে অনেক হাতির। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আমরা ক্রমাগত কয়েক বছর ধরে দেখে যাচ্ছি, লাগাতার হাতিদের ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু। হাতির মৃত্যু নিয়ে কয়েকটি আন্দোলন এবং পরিবেশ কর্মীদের কিছু আলোচনা সরকারী স্তরে হয়েছে বলেও জানা গেছে। কিন্তু পশুপাখিদের যে তৃষ্ণা মেটাবার জল, তা দুষ্প্রাপ্য হয়েছে প্রকৃতিতে, এই বিষয়টিতে একটু নজর দেওয়া দরকার।

চারিদিকে প্রচুর পরিমাণে বহুতল নির্মাণ হওয়ার দরুন একদিকে যেমন ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে গেছে বা যাচ্ছে, তেমনই প্রচুর গাছও কাটা যাচ্ছে। সরকার থেকে কড়া আইন করে যদি প্রতিটি আবাসনে কিছু বড় গাছ এবং পাখিদের জল খাওয়ার মত ছোট একটি জলাধার তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণের ও তদুপরি আইন মানার দিকটি দেখা হয় তাহলেই সৃষ্টিশীল উন্নয়ন সম্ভব।

মাছ : আমাদের পশ্চিমবঙ্গ-এর বাজারের প্রধানতম অঙ্গ হল মাছ। অন্যান্য রাজ্যের লোকেরা বাঙালী বলতে মাছ বোঝে, অনেককাল থেকে প্রচলিত একটি কথাই আছে, 'মাছে ভাতে বাঙালী'। সেই পশ্চিমবঙ্গে হঠাৎ লক্ষ লক্ষ মাছ মরে গেল। কয়েকটি খবর এরকম :

প্রথম : ২৮ শে জুলাই ২০১০ বোটানিকাল গার্ডেন অঞ্চলে "ঝিল ভরা মরা মাছ কিনছেন বাসিন্দারা"।

দ্বিতীয় : ২৯ শে নভেম্বর ২০১১—উত্তরবঙ্গের করলা ওঘোলানি নদীতে কীটনাশকের প্রভাবে প্রচুর মাছ মারা যায়...।

তৃতীয় : ১লা ডিসেম্বর ২০১১ লবণ হ্রদ অর্থাৎ সল্ট লেক বনবিতান পার্কে প্রচুর মাছ একসাথে মারা যায়, যা প্রধানতঃ জলে বিষক্রিয়ার ফল।

২রা ডিসেম্বর ২০১১-র সংবাদে জানা যায়, বোটানিকাল গার্ডেন-এর (অঞ্চল) দায়িত্ব প্রাপ্তের কাছে বিচার-ব্যবস্থার কাছ থেকে নির্দেশ যায়, সেখানকার বিয়ে বাড়ি বনভোজন, চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রহণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ করার জন্য এবং তৎসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জমা দেওয়ার কথাও বলা হয়। কিন্তু ৩০ শে মার্চ্চ ২০১৩ তে এসেও দেখা যায় সেই বোটানিকাল গার্ডেনে "মরা মাছের মিছিল"-এর পুনরাবৃত্তি হল। আবারও কি বিচার-ব্যবস্থা জানতে চাইবে...? এটাই কি সমাধানের একমাত্র পথ?

ইলিশ : ২০১৩ তে এই ইলিশমাছ-এর দাম হয়েছিল ১০০০/- প্রতি কেজি। পরবর্তী বছরগুলোতে তা আরও বেড়েছে। গত ৩/৪ বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, মোহনার মুখে যেখানে ইলিশ মাছ ঢোকে সেখানে নজরদারির অভাব। আর এর ফাঁক গলেই " ছোট ফাঁসের জাল দিয়ে ধরা পড়ছে ছোট ইলিশ (৫০০ গ্রামের নীচে যার ওজন)"—বাংলার সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষেরা এই ইলিশমাছ খেতে পারছে না। যেখানে বাংলাদেশ কিন্তু পেরেছে তাদের ইলিশ মাছকে বাড়তে দিতে, ছোট মাছেদের না ধরে। পরিবর্তে ইলিশের কৃত্রিম প্রজনন করিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর খবর পাওয়া গেল ২২/০৫/২০১৩-এ দেখা গেল, এই কৃত্রিম প্রজনন নিয়েই আগে বেশ কিছু কাজ হয়েছিল, পুকুরে দুধ ঢেলে ইলিশ মাছেদের বড় করার, কিন্তু তা মোটেই কাজে দেয় নি। শেষ পর্যন্ত ১৩ই ফেবউ ২০১৪- তে দেখা গেল, "নিষেধাজ্ঞা তুলেছে ঢাকা, ফের পাতে পদ্মার ইলিশ"। অর্থাৎ সেই পরমুখাপেক্ষিতা। বাংলাদেশে ইলিশ মাছ বড়ো হতে পারল কিন্তু আমরা পারলাম না। খবরে হতাশা প্রকাশিত হয়েছে, "নজরদারির অভাবেই ছোট ইলিশ বিকোচ্ছে দেদার"। ইলিশ ছাড়া অন্যান্য চারা মাছ বা ছোটো মাছগুলি আমাদের এখানে যথেষ্ট সংকটে রয়েছে বলেই দেখা গেছে—"সংকটে ভেড়ির মাছ চাষ" অথবা "পাতে মোরলা পুঁটি ফিরবে কিনা জানেন না মন্ত্রী", ...এবার খলসে পুঁটিদের বাঁচান"—গোছের খবরগুলিতে। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই সরকারি উদ্যোগে একটি "টাস্ক ফোর্স" গড়া হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ; সময়-ই বলবে টাস্ক ফোর্স তাদের টাস্কে কতটা সফল হল।

গাঙ্গেয় ডলফিন তো প্রায় দেখাই যায় না। শেষ ২০১০ জানুয়ারীতে চুঁচুড়ার গঙ্গায় দেখা যায় এক মৃত ডলফিন। পরে পাওয়া আর একটি অসুস্থ ডলফিনকে শুশ্রূষা করে ছেড়ে দেওয়া হয় ভাগিরথীতে। বারবার এই বিরল প্রাণীটিকে ট্রলার বা মাছ ধরা জালে আটকে প্রাণ দিতে হয় অকারণ। জলের গুণগত মান ঠিক আছে কিনা, তা, কোনো পরীক্ষা ছাড়া বোঝা যায় এই প্রাণীটির উপস্থিতি দেখে; আর সেটাই এখন একদম অনুপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গায়, তাই বোঝার অসুবিধা হয় না যে, জলে দূষণ কোন পর্যায়ে গেছে। তবে

সব থেকে মারাত্মক ব্যাপার এই যে, সারা পৃথিবীতে লোভ এত বেড়ে গেছে যে, "পেরুর ডলফিন হত্যা", "ডলফিন হত্যা জাপানে" বা হাঙ্গর 'শিকারের' ছবি দেখেও স্তম্ভিত হতে ভুলে যাই আমরা।

এক-ই ভাবে, কচ্ছপ ও প্রায় খবরের মধ্যে থাকে, অবৈধ ভাবে বিক্রি বা রপ্তানী হওয়ার জন্য। তুলনামূলকভাবে তবু বাঘ অনেক বেড়েছে এবং তাদের রক্ষা করা দিয়ে W W F ক্রমাগত কাজ করে চলেছে।

শকুনের মত সমাজবন্ধু পাখিও বারবার বিলুপ্তির খবরে এসেছে। এর জন্য উত্তরবঙ্গ গবেষণা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে গাবাদি পশুকে দেওয়া DICLOPHENAK গোত্রের ওষুধ, যার একটি মানুষকেও দেওয়া হয় এবং কেউ কেউ তাতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এক-ই গোত্রের ওষুধ খেয়ে যে গবাদি পশুরা মারা যায়, তাদের ওই শকুনরা খেলে তাদেরও মৃত্যু অবধারিত "অবিলম্বে এই ওষুধ-এর ব্যবহার বন্ধ করা উচিত।

বন্যপ্রাণী পাচার তো চলতই, কিন্তু ইদানিংকালে যোগ হয়েছে তার সাথে তক্ষক/বহুরুপী পাচার। শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। মূলত: এগুলি চীনে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন ওষুধ তৈরী করার জন্য। এ যাবৎকাল পর্যন্ত ক্রমাগত যে সংবাদ আমাদের নজরে আসছে তা থেকে পরিষ্কার একটি চিত্র সামনে আসে, যে, উন্নয়ন ও নগরায়ন ইত্যাদি মানুষের জীবনে ঘটছে বটে, কিন্তু অন্য প্রাণীকূল/জীবজগত বিপন্ন হয়ে পড়ছে জল, বনাঞ্চল, খাদ্য ইত্যাদর অভাবে। এছাড়া মানুষের লোভ তো আছেই।

পশ্চিমবঙ্গ এবং তার বাইরেও গত চার বছরে যে সব পাখি এবং অন্যান্য প্রাণী খবরে এসেছে তার একটা তালিকা এখানে দেওয়া হল ঃ—

পাখি: বসন্ত বৌরী, রাঙামুরী, চড়াই, কাক, শালিক, সারস বক, মাছরাঙা, দূর্গা টুনটুনি, কাঠঠোকা, টিয়া মৌটুসি, বাদুড়, খঞ্জনা, সবুজ পায়রা, কোকিল, নীল ডানার পরিযায়ী এছাড়া অন্যান্য পরিযায়ী পাখি।

অন্যান্য প্রাণী : গাঙ্গেয় ডলফিন, বিভিন্ন মাছ, ৫০ কিলো ক্যাটফিস্, কচ্ছপ, কুমীর, সাধারণ সাপ, কাঠবিড়ালী, হাতী হায়না, চিতাবাঘ, বিড়াল, তেঁতুলে বিছে, তক্ষক, তিমিমাছ, বাঘ।

এর বাইরে নিশ্চয় বহুরকম প্রাণী রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। আছে মশা মাছি মৌমাছি কীটপতঙ্গ, কিন্তু সংবাদপত্রে তাদের কথা পড়া যায় শুধু মানুষের রোগভোগের সূত্রেই।

প্রাণীদের অদ্ভুত আচরণ : বিগত ৪/৫ বছর ধরে প্রকাশিত বাংলা দৈনিক খবরের ভিত্তিতে এবং বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমেও আমি ভীষণভাবে লক্ষ্য করেছি একটি খবর, তা হল, প্রাণীদের অদ্ভুত আচরণ। যদিও তার উপস্থাপনা কখনও এই নামে ছিল না। সেগুলি একঘেয়ে খবরের বাইরে খুব নগণ্য একটু সময়ের খবর, "হাতি আক্রমণ করেছে" অথবা "বাঘ আক্রমর করেছে", কিম্বা "কুকুর বানরকে কামড়ে মেরে ফেলেছে" বানর কুকুরের বাচ্চাকে বাঁচিয়েছে"। আরও দেখা গিয়েছে, বানরেরা রেল রাস্তা, স্কুল, পোস্টঅফিস-এ এসে বসে থেকেছে/অবরোধ করেছে মানুষকে। এরকম হাজারো খবর কোটি কোটি মানুষ পড়েন কিন্তু ভুলে যান। স্বাভাবিক, খুব স্বাভাবিক; মানুষের হাজারো বিপদ সমস্যা জটিলতার খবরই জেনে, পড়ে, মনে রেখে কিছু করা যায় না, তো জন্তু জানোয়ার নিয়ে কে মাথা ঘামাবে!

□□

আমি বলি, আসলে কিন্তু উল্টো। এই খবরগুলো কিন্তু আমাদের বিপদের চরম বার্তা নিয়ে আসছে; আর আমরা চুপ করে চোখ-কান বন্ধ করে বসে সেই বিপদকে তরান্বিত করছি। যেমন এই যে হাতিরা ক্রমাগত গ্রামে ঢুকছে, ভাঙছে ঘর, গাছ, মানুষকে আছড়ে মারছে—কেন? কারণ তাদের ঘরে আমরা হাত দিয়েছি। তাদের খাবার কম পড়ছে। অকারণে তাদের মারছি শুধু তাদের দাঁতের লোভে। তাই হাতিও আজ পাল্টা আক্রমণ হানছে। মানুষের সভ্যতা-বোধ যদি কোনোভাবে আর জঙ্গলের প্রাণীদের জীবনযাত্রা বিঘ্নিত না করে, তারা যদি জঙ্গলেই নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারে ও তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য পেয়ে যায় ত তাহলে কোনোভাবেই তারা মানুষের জীবনেব ক্ষতি করবে না, করে না।

□□

একইরকমভাবে, গবাদিপশু ও সাধারণ পাখী ও প্রাণীরা তাদের মত করে খাদ্য পাচ্ছে না। যাও বা পাচ্ছে তাও নোংরা

বা আবর্জনা সমেত। তাই মাছ মরে যাচ্ছে, বাঘ জল না পেয়ে চা বাগানের কূয়োতে পড়ে যাচ্ছে, হাতি বিষ জল খেয়ে ফেলছে অথবা সেনাবাহিনীর জলের ট্যাঙ্কে পড়ে যাচ্ছে, বানর লোকালয়ে মানুষের বাড়িতে এসে ঢুকছে একটু খাবারের খোঁজে। এ বিষয়ে সবথেকে মর্মান্তিক একটি খবর : "৪০ বছরের এক হস্তিনী ২ কেজি প্লাস্টিক এবং কিছু এ্যালুমিনিয়াম ফয়েল খেয়ে মারা যায় কেরলের সবরীমালায়। ২ মাস ধরে সবরীমালায় এসেছেন লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থী। তাদের ফেলে যাওয়া প্লাস্টিক জঙ্গলেও চলে যায় এবং অন্যান্য খাবারের সাথে তা হাতিটির পেটে চলে যায় ও অন্ত্রে আটকে গিয়ে কয়েক সপ্তাহ সে খাবার-ই খেতে পারেনি"। পরিবেশ নিয়ে চরম উদাসীনতা থেকে কি ভয়াভহ পরিণতির দিকে আমরা যাচ্ছি তার উদাহরণ হিসেবে আর কিছু দরকার নেই। কবে আমাদের চোখ খুলবে! আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের রাস্তায়ও কি ব্যাপকভাবে প্লাস্টিক ফেলা থাকছে আর আমরা দেখি গরুরা খাবারের সাথে ওই প্লাস্টিক খাচ্ছে বাধ্য হয়ে। এরপর এখানেও কোনোদিন যদি গরুদের বা সাধারণ প্রাণীদের ব্যবহার বদলে যায়, তাহলে অবাক হবেন না।

কিছুদিন আগে যে, "বানরটি একটি কুকুরের ছানাকে কয়েকদিন ধরে বাঁচিয়ে ছিল, সেই বড়ো কুকুরদের হাতেই প্রাণ দিলো"—খবর পড়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছিলাম। তার প্রধান কারণ, কুকুর বানরকে মেরেছে বলে নয়; বানরটি শুধুমাত্র গাছ নেই বলে পালাতে পারল না বলে! সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছরে গাছ কাটা গেছে ৩ লক্ষেরও বেশী, কিন্তু লাগানো? নাহ্ এর ধারে কাছেও নেই, তাহলে কেন বদল হবে না প্রকৃতি ও প্রাণী-প্রকৃতি?

আমি নিজে আমার অঞ্চল এবং অন্য তিনটি জেলাতে মানুষজনের সাথে কথা বলে দেখেছি, কাক, চড়াই, শালিক পাখিদের ব্যবহার বদল হয়েছে বিগত ২/৩ বছরে।

□□

চড়াই : শোনা যায় "১৯৯২ সালে একবার কলকাতায় ম্যালেরিয়া হয়েছিল, আর তখন চড়াই পাখিরা তুলসী পাতা ও অপরাজিতা গাছের কচি পাতা খেতে আরম্ভ করেছিল তার আগেই"— খবরটি পেয়ে আমি বুঝতে পারলাম চড়াই পাখিদের অদ্ভুত এই আচরণের কারণ। যেবার কলকাতায় খুব ডেঙ্গু হল, তখন লক্ষ্য করা গেলো উত্তর কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা দমদম নদীয়া (যেগুলি আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছিল) ইত্যাদি জায়গায় চড়াইপাখিরা তুলসীপাতা কেটে কেটে খেয়ে যাচ্ছে। তারপর থেকে ক্রমাগত দেখছি ঋতুপরিবর্তনের সময় ওরা ঠিক সকাল সাড়ে ন'টা থেকে ১১টা পর্যন্ত আবার সাড়ে বারোটা থেকে দুপুর তিনটে পর্যন্ত পাতা খেয়ে যায়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ওরা প্রতিষেধক হিসেবে তুলসীপাতা ও অপরাজিতা পাতাকেই সঠিক মনে করে। শুধু খাওয়াই নয়, এমনকি বুলবুলি পাখি বাসা বানানোর সময়, প্রথম ধাপে নরম কিছু রাখার পর তুলসীমঞ্জরী রাখলো—অর্থাৎ বিষ-ক্রিয়া এড়ানোর পথ। এ এক সুন্দর শিক্ষা।

শালিক ও কাক : কলকাতা শহর তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে গাছ ভীষণভাবে কমে যাওয়ায় শালিক ও কাকেরা আর গাছে বাসা বানাতে পারছে না; বাধ্য হয়ে বাড়ি, ফ্ল্যাট বা হাউসিং কমপ্লেক্স-এ বাসা বানাতে চাইছে। গত ২০১২ সালে বরানগরে একটি গাছে ৭টি বাসা বানিয়েছিল কাকেরা। একই চিত্র দেখা গেছিল মোমিনপুর-এও। বেলঘরিয়ার একটি আবাসনে প্রতি বছর-ই পাইপের আড়ালে থাকার জায়গা খুঁজে নেয় কয়েকটি শালিক ও কাক।

এছাড়া কাক ও অন্যান্য পাখিদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে নগরসভ্যতার জোরালো আলোর বন্যা; তাদের বিশ্রাম নেওয়ার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে জোরালো আলোর কারণে। রাতের বেলা তাই কাকেদের চিৎকারও বেড়ে গিয়েছে।

ছড়ায় পরিবেশ

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়
(kausik78@hotmail.com)

জলাভূমি

মেছো ভেড়ি হয়ে গেলে আই.টি. লেগুন
প্রকাশ্য দিবালোকে জলাভূমি খুন।

বিষ নিয়ে তাজা জল—
ফিরে কে বা দেবে বল,
সভা ডেকে মোড়লেরা গায় রামধুন।

চারপেয়ে

চার পেয়ে ঘোড়া থেকে গাড়ি চার চাকা,
জ্বালানী যোগাতে গিয়ে ভাঁড়ারটি ফাঁকা।

ভূগর্ভ তেল শেষে
টানাটানি দেশে দেশে
ঠোকাঠুকি লাগে লিরা ডলার বা টাকা।

নদীবাঁধ

রায়ডাক তিস্তা—
কতো দেখি বিস্তার।
গ্রীষ্মটি এলো যেই
দেখি ততো জল নেই—

বাঁধা পড়ে গেছে বাঁধে
অরণ্য যেন কাঁদে
ভূমিক্ষয়ে পলি জমে
কোথা তার নিস্তার।

ভুবনডাঙা

পলাশ বাড়ির দিদি তান শ্যামলী
ভুবনডাঙা ফেলে গিয়েছো চলি।

নদী মাঠ বনছায়ে
ভালবেসে মাটি মায়ে
তিন মহাদেশে গেছো লহর তুলি।

ক্লিয়োপেট্রার শেষ নিঃশ্বাস

নিখিলেশ পাল
(nikhiltelemaker@gmail.com)

.....' হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি
পৃথিবীর পথে
সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে'.....

চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা রাজকাপুর তাঁর এক ছবিতে বলেছিলেন "গড্ মেড ল্যান্ডস, ম্যান মেড বর্ডারস্"। রাষ্ট্রনায়কদের কেরামতি হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে কাঁটাতার লাগানো। '৪৭'-এর সীমারেখা না মেনে এই বঙ্গের শরতের মেঘ উড়ে যায় ওই বঙ্গে। পাঞ্জাবের হাওয়া বয়ে যায় পেশোয়ারে। পরিযায়ী পাখিরা যেমন উড়ে আসে সাইবেরিয়া থেকে সাঁতারাগাছির ঝিলে বা চিল্কায়। আমাদের ভূপৃষ্ঠের উপরে গ্যাসীয় অবয়ব তথা বায়ু মন্ডলের এই সীমাহীন স্বাধীনতাকে আমরা 'সুপার গণতন্ত্র' বলতেই পারি। যেখানে দেশ ও কালের শৃঙ্খল ও শৃঙ্খলা ভেঙে বায়বীয় বিশ্বের অবাধ বিচরণ। তাদের নিজস্ব সংবিধান। '.....শৃঙ্খলটা ভাঙবো তবু শৃঙ্খলা তো ভাঙবো না' এমন মেঠো কাব্যের কোন কদর নেই আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার।

কে কত দূষণের ভাগীদার আর কে-ই-বা দূষণ বন্ধের দাবীদার। দোষারোপ আর উৎকট দাম্ভিকতার তর্জায় একের পর এক বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন পুরো বা আংশিক ব্যর্থ অথবা গয়ংগচ্ছ। আশার আলো (টুঁইঙ্কল্ টুঁইঙ্কল লিট্‌ল স্টার....) দেখিয়েছে সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া শৈল্পিক প্যারি নগরীর বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে উষ্ণায়ণ প্রসঙ্গ।

প্যারিসের প্যাশান হাওয়ায় ভেসে কতদূর পৌঁছায়, না ভেস্তে যায় তা ভাবাচ্ছে ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের।

কয়েক দশক আগে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পিনাটুবো আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত ধূলো, ছাই আর সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাসের কুণ্ডলী বাতাসে মিশে গোটা পৃথিবী চক্কর খেয়েছিল দু'বছর ধরে, পাসপোর্ট, ভিসার তোয়াক্কা না করে। এই সব মাইক্রন সাইজের সংখ্যাহীন (পড়ুন প্রাইস লেসের মতো নাম্বার লেস.....) ধূলোকণা ও পাতলা গ্যাসীয় মেঘের আস্তরণ কখনো সূর্যালোককে শোষণ করেছে, কখনও প্রতিফলিত করে মহাশূন্যে ফিরিয়ে দিয়েছে। সেই সময়কালে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা কমে গিয়েছিল ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতবছর আইসল্যান্ডের আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ইউরোপের আকাশে হাজার খানেক উড়ান এক সপ্তাহ ধরে বাতিল হওয়ায় (এয়ারপোর্ট গুলোর মুহুর্মুহু এ্যানাউন্সমেন্ট '....ফ্লাইট নম্বর.....ক্যানসেলড্') উড়োজাহাজ জ্বালানী জনিত বায়ুদূষণ তো কিছুটা কমেই ছিল; যদি মরুভূমি বা মনুষ্যবসতিহীন পাহাড় পর্বতে মাঝে মাঝে কখনও ২/১ টি আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠে, দূষণ কমানোর অ্যান্টিডোট তৈরির প্রাকৃতিক ল্যাবরেটরী হিসেবে ভলক্যানোদের ভাবা যেতে পারে।

সুপার কম্পিউটারের সহযোগিতায় আবহবিজ্ঞানীরা বুঝেছেন যে কোন আঞ্চলিক বাতাস তার ক্ষুদ্র অণু-বিশ্ব নিয়ে সমসত্ত্ব ভাবে মিশে যায় গোটা পৃথিবীর বাকি বায়ুমণ্ডলে সর্বাধিক ২০০০ বছরের মধ্যে।

ভূমধ্যসাগরীয় হাওয়া এক সনাতনী সংগীতের ঘরানার পালে 'সোনার তরী' ভেসে আসে হিমালয়ের দুর্বল উচ্চতার কোল ঘেঁষে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে। 'এলেম নতুন দেশে' রোদ ঝলমল সবুজ উপত্যকায়, মেক্সিকো উপসাগরের ঘূর্ণিঝড়ের ক্লান্ত অবশেষ এক উদাসী পথ পরিক্রমায় মাদাগাস্কারে, বঙ্গোপসাগরের সাইক্লোনিক এপিসেন্টার সুন্দরবনে গণ অভ্যুত্থান করে এক শান্ত, ভীরু দীর্ঘমেয়াদী অভিযানে পাড়ি দেয়-কে জানে উত্তরবঙ্গে নাকি অজানা সুইস আল্পসের বুকে।

আবার মিসিসিপির হাওয়া বয়ে আসে 'এক দিন করবো জয়' এর প্রত্যয়ে গাঙ্গেয় সমতলভূমি বা ভল্গায়। ভূপেন হাজারিকার গানের মতো।

"....দক্ষিণে হাওয়া, উত্তরে হাওয়া, উষ্ণ শীতলে মেশে
ঈশাণের কোণে ফাগুনের মেঘে, উদ্দাম যাওয়া আসা
ভয় হয় বুঝি বাজে-বিদ্যুত, খেলা মাতে সংঘাতে
প্রেয়সী এ যেন আমাদের ভালোবাসা....।"

(কবি— বিষ্ণু দে)

একদিকে সভ্যতার সাথে আবহাওয়ার নিরন্তর সংলাপ ও অন্যদিকে সভ্যতার সৃষ্ট গ্রীন হাউস গ্যাসের, পরিবেশের ও প্রকৃতির নিরন্তর সংঘাত।

প্রিয় পাঠক, দূষণের 'রচনা সংকলন' এই লেখার প্রতিপাদ্য নয়। আবহাওয়ার নাটকীয়তা না-কি নিয়তি। নাটকের কথাই যখন এসে গেল, এক শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের-ধরা

যাক শেক্সপিয়রের—নাটকের নায়ক নায়িকাদের শেষ অঙ্কের পরিণতি! শেষ নিঃশ্বাসের শেষ অঙ্ক-ধরা যাক জুলিয়াস সিজারের-শেষ নিঃশ্বাস যা না-কি ঘটে ছিল (হয়তো বা বাস্তবও) ঠিক ওই ২০০০ বছর আগেই।

"দূরন্ত ঘুর্ণি এই লেগেছে পাক/এই দুনিয়া ঘোরে বন্ বন্
ছন্দে ছন্দে কত রং বদলায়, রং বদলায়"

অঙ্কেই ধরা যায় ব্যাপারটা। আমাদের পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের মোট ক্ষেত্রফল $4 \pi R^2$ (R= পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, ৬৩৬৮ কিলোমিটার)। ৫ কিলোমিটার উচ্চতার বায়ুমন্ডল। ৫ কিলোমিটার এর উপর বায়ুর ঘনত্ব দারুণভাবে কমে যাওয়ায় গড় উচ্চতা ৫ কিলোমটার ধরাই বাস্তবোচিত। তাহলে পৃথিবীর প্রাণদায়ী অদৃশ্য গ্যাসীয় বলয়ের/আচ্ছাদনের মোট আয়তন দাঁড়াচ্ছে $4 \pi R^2 X 5$ ঘন কিলোমিটার। $4 X 3.14 X 6368 X 6368 X 5$ ঘন কিলোমিটার। কিলোমিটারকে মিটারে ভাঙলে! $4 X 3.14 X 6368000 X 6368000 X 5 X 1000$। মাথা ব্যথা করা সুদীর্ঘ রাশিমালাকে ঘনীভূত করলে দাঁড়ায় $2.55 X 10^{18}$ ঘন লিটার। যেহেতু এক ঘনমিটার =1000 লিটার, তাই $2.55 X 10^{21}$ ঘনলিটার।

ধরা যাক, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ গভীর শ্বাস গ্রহণে নিতে পারে প্রায় ১ লিটার পরিমাণ বায়ু, যার ভিতর অণুর সংখ্যা $3 X 10^{22}$ অর্থাৎ আমাদের বায়ুমন্ডলে যত 'লিটার' বায়বীয় পদার্থ আছে ($2.55 X 10^{21}$) তার দশগুণ 'অণু' রয়েছে ১ লিটার বায়ুতে।

শুধু জুলিয়াস সিজারই কেন, সমসাময়িক অ্যান্টনি ও ক্লিয়োপেট্রার ঐ এক লিটার শেষ নিঃশ্বাস গত দু'হাজার বছরে সম্পূর্ণভাবে মিশে গেছে সমগ্র পৃথিবীর বাতাসে। আমাদের প্রতিদিনের প্রতিবার শ্বাস গ্রহণে মিশরের রানীর শেষ নিঃশ্বাসেরও সম্ভবত প্রায় দশটা করে অণু গ্রহণ করছি।

ভৌত রসায়ন আর আবহাওয়ার সোসালিজমে (না-কি আন্তর্জাতিকতায়) এক টুকরো ইতিহাস জীবন্ত হয়ে আছে স্মৃতি সত্ত্বা ও সুদূর ভবিষ্যতে। "স্কাইলার্ক, যেমন পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে দূর দিগন্তে উড়ে যায়, পাশাপাশি সে মাটির টানে নেমে আসে। পৃথিবীর মায়া তাকে বেঁধে রাখে অসীম মমতায়। হে নভশ্বর চারণ কবি। আকাশের তীর্থ যাত্রী।"

তথ্য সূত্র—

(ক) Practical Astronomy, A User-friendly Handbook for Sky Watechers-Albion Publishing, Chichester. By : Robert Mills.

(খ) বিদেশী বিহঙ্গ (অনুবাদ) দীনবন্ধু ঘোষ। প্রকাশক ঃ অভেনেল প্রেস, মেমারী, বর্ধমান।

কৃতজ্ঞতা ঃ শমিতা, অধ্বর্য্যু, সঞ্চিতা ও তার ছাত্রছাত্রীরা।

আমাদের জানা অজানা যে মানুষেরা
মানবকল্যাণে সমাজকল্যাণে পরিবেশকল্যাণে
নীরবে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের জানাই আমাদের শ্রদ্ধা

"সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও"

উৎসর্গ

'মহারাষ্ট্র অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন' আন্দোলনের নেতা

নরেন্দ্র দাভোলকার

সত্য ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করে মিথ্যা ইতিহাসের কারবারিদের অসহিষ্ণুতার শিকার

এম এম কালবুর্গি

শিবাজী এক ধর্মনিরপেক্ষ ও উদারচেতা মানুষ ছিলেন-
এই মতের প্রবক্তা গোবিন্দ পানসারে

ব্লগার-অভিজিৎ রায় ওয়াসিকুর রহমান
অনন্ত বিজয় দাশ

রণজিৎ ঘোষ, সত্য ব্রত কর, নিশীথ অধিকারী, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত কুমার দাস, বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত, অভি দত্ত মজুমদার, শুভাশীষ মাইতি, স্বপন কুমার দাস, মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, অমিত চ্যাটার্জী এবং জানা অজানা আরও যারা একই লক্ষ্যে সহযোদ্ধা।

.....অজৈব রাসায়নিক বিষ ক্রমবর্ধমানভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে.... এ যেন প্রাচীন গ্রীক উপকথার প্যাণ্ডোরার বাক্সের ডালা খোলার মতো। এযাবৎ ধরিত্রী যেসব বিষ ধরিত্রীর গর্ভে আটকে রেখে পৃথিবীর প্রাণ রক্ষা করে এসেছিল তারা এখন বিমুক্ত হয়ে জীবজগৎকে বিনাশ করে চলেছে'।

—মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার।

"ভারতবর্ষের অর্থনীতি, ভারতবর্ষের রাজনীতি, ভারতবর্ষের বিজ্ঞানচর্চা, ভারতবর্ষের প্রযুক্তি, ভারতবর্ষের শিল্পনীতি, ভারতবর্ষের কৃষিনীতি কোনও স্বাধীন নীতি নয়। .... আমাদের সমস্ত নীতিই একটা নির্ভরতার অর্থনীতির ও নির্ভরতার রাজনীতি।

—অভি দত্ত মজুমদার।

স্বপন কুমার দাস (১৯৫৫ — ২০১৫)

Vigyan O Vigyankarmi
Reg. No. 34929/79

Rs. 35.00

Vol. XXXVII No. 1-4
January 2015 - December 2015

প্রয়াত বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইতের একটি পরিচিতি ও ছবি উইকিপিডিয়ায় নিচের দুটি URL -এ পাওয়া যাবে

পরিচিতি :**Draft : Bishuddhananda Purokait** htto://speedydeletion.wikia.com/wiki/Draft:Bishuddhananda Purokait

ছবি **File : Bishuddhananda Purokait.jpg** htto://commons, wikimedia.org/wiki/file:Bishuddananda Purokait.jpg

বিজ্ঞান সমাজ ও মানুষ : সৌমেন গুহর নির্বাচিত রচনার একটি সংকলন ই-বুক হিসেবে পড়া যাবে ঃ

https://sites/gppg;e/cp,/site/saumenquha1/

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র : স্মরণ বিস্মরণ ও নির্মাণ— রবীন মজুমদার (চর্চাপদ, কলকাতা)

প্রকাশক : চর্চাপদ, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, ফোন : ০৩৩-২২৫৭-৩১৪৪

Science Education : Reviews Insights and Ideas (Proc. Symp.Sc.Edu.,Kolkata)

'পিছু ডাক' (নানামুখ, নিলয় রায়, ১/১ কেদারনাথ ভট্টাচার্য লেন, কলকাতা-৭০০০৩৬)

'নিমযুগ' (কালধ্বনি, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, ২/১A আশুতোষ শীল লেন। কলকাতা-৭০০০০৯)

অভিজিৎ লাহিড়ীর একটি ওয়েববসাইট, যেখানে তাঁর রচিত ও প্রকাশিত "Basic Physics: A Comperehensive (Survey" ও আরও কয়েকটি বই-এর পরিচিতি এবং পদার্থবিদ্যা'র উপরে নানা আলোচনা পাওয়া যাবে

http://physics and more.net/Index.html

সুভাষ চন্দ্র গাঙ্গুলীর নির্বাচিত বাংলা ও ইংরেজী রচনা অনুবাদ (গদ্য ও পদ্য) ছড়া সম্বলিত (বিজ্ঞান, বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞান-সমাজ-ধর্মের স্পর্শতল, মানবিক অধিকার, আন্দামানের জারোয়া ইত্যাদি সম্পর্কিত) একটি ই-বুক ও একটি ওয়েবসাইট :

Writings of Subhas Chandra Ganguly : An Open Access E-book
http://sites.google.com/site/subhascganguly/writings
RANDOM THOUGHTS https://sites.google.com/site/writingsofsganguly/

অনুপ্রেরণার উদ্যোগ ও পড়বার পত্রিকা

আমাদের হাসপাতাল, ফুলবেড়িয়া, তেঘরি, বাঁকুড়া; অসুখ বিসুখ-২৫৪ লেক টাউন B-ব্লক (M : ৯০৩৮৯৯৪৯৩)

শ্রমজীবী হাস্পাতাল-বেলুড় (বালি) শ্রীরমাপুর (বড় বেলু), সরবেরিয়া (সুন্দরবন); শ্রমজীবী স্বাস্থ্য

মন্থন সাময়িকী, B২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা, কলকাতা-১৮ ফোন : ২৪৯১-৩৬৬৬

প্রয়াত কবি সমর সেন প্রতিষ্ঠিত ও বর্তমানে তিমির বসু সম্পাদিত, গত ৪৮ বছর ধরে প্রকাশিত

ইংরেজী সাপ্তাহিক Frontier -এর (৬১ মট লেন, কলকাতা- ৭০০০১৩, ফোন : ২২৬৫-৯২০২)

ওয়েবসাইট (রবীন চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত-পরিচালিত) : http://frontierweekly.com

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে রচয়িতা, 10 কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা-700 001 থেকে মুদ্রিত।